সুনীলকুমার ঘোষ

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৭১
১৪ মে ১৯৬৪

প্রচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ

গ্রন্থন : মোসলেম্‌ খান এণ্ড ব্রাদার্স

তিন টাকা

সুরভি প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীভবানী প্রসাদ দে কর্তৃক প্রিণ্টার্স ডিও প্রেসিয়াস, ১৫, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীগণেশ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

মায়ামারীচ

এপিডেমিক

রেণীপার্ক

সানিভিলা

কাহিনীক্রম : বিলাসিনী রাই, অহল্যা, উত্তর বসন্ত, পিসিমা, প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রত্যাবর্তন, স্টাফ ডাক্তার, শেষ দলিল

বিলাসিনী রাই

তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এরা আমার চারপাশে প্রহরী বসিয়েছে; তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি।

পারব কেমন করে? তুমি তো আমার কাছে সংস্কারের রাজপথ বেয়ে আসনি। আমার মনের অন্তরতম স্থানে ছিল তোমার অপরূপ রূপের স্পর্শবিহীন ছোঁয়া। তোমাকে আমি কোনদিনই আমার তর্কজিজ্ঞাসার মীমাংসা হিসাবে পাইনি; পাইনি ধরা-ছোঁয়ার নিবিড়তার মধ্যে। পেয়েছি অকস্মাৎ, মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের শিহরণে, আর মুহূর্তে হারিয়ে-যাওয়া কল্পনার বিলাসে। আমার হৃদয়-স্পন্দনের আড়ালে-আড়ালে তোমার নিত্য যাওয়া-আসা।

ওরা বলে, আমি ব্যর্থ, আকাশচারিণী। প্রভাত সূর্যের রঙিন আলোকে আমি স্বর্ণরেণু বলে ভুল করেছি, যেমন স্বর্ণমৃগকে সীতা একদিন জীবন্ত মৃগ বলে ভুল করেছিল। স্বর্ণমৃগ মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। আর স্বর্ণআলো সোনা নয়, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীকে ভস্ম করার দাহ। ভুল আমি করিনি তো করল কে?

আমি হাসি। মুঠো-মুঠো সোনা-হীরে-জহরত দিয়েই বুঝি ওরা সার্থকতার ইমারত তৈরী করে। যা-কিছু স্থূল, যা-কিছু মানুষকে তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, যা-কিছু জৈবিক ভোগ-লালসার ক্লেদপঙ্কে মানুষকে ডুবিয়ে মারে, তাই ওদের অভিধানে সার্থকতা। বিলাস-ব্যসনের ক্রম-প্রক্ষিপ্ত, ক্রম-প্রসারিত দিগ্‌বলয় হিংসার কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন করেই ওরা সার্থকতার রাজপথে দৈত্যে-দীঘল বিপর্যয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়ায়। জীবন-যুদ্ধের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অহমের বিস্ফোরণই ওদের সার্থকতার শেষ পরিচয়। দূর্বাসার সেই উদ্ধত ব্যক্তিত্ববোধ আজ ওদের সংস্কৃতির প্রতি লোমকূপে দুরারোগ্য ক্যানসারের সৃষ্টি করেছে। স্নেহই বল, প্রেমই বল, ভালবাসাই বল, সবই সেই দুষ্ট ব্যাধির শিকারমাত্র। তাই জীবনের ভস্মস্তূপের ওপর ওদের সার্থকতার স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে।

আমি জানি, ওদের বিচারে আমার দণ্ড ভয়ঙ্কর। যে নারী বিচারিণী, সমাজ তাকে ক্ষমা করবে না। দণ্ড দেওয়ার অধিকার ওদের রয়েছে। শাস্ত্র, প্রথা,

লোকধর্ম, আর অনুশাসন, সবই ওদের কণ্ঠস্থ। সংসারে নারীর কর্তব্য নিয়ে ওরা বহু প্রবন্ধ লিখেছে, বহু পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে। সে সমস্ত আমি জানিও না, বুঝিও না। কেবল এইটুকু জানি যে নারীর হৃদয় নিয়ে ওরা চিরকালই ছিনিমিনি খেলেছে। সেখানে নারী যদি বা থাকে, নারীত্ব নেই এতটুকু।

কথাটি আমিও যেমন জানি, ওরাও ঠিক তেমনি জানে। আর জানে বলেই ওরা আমার নারীত্বকে রেফ্রিজারেটরের হিমগর্ভে বন্দী করে রেখেছে, সংস্কারের দণ্ডে আমার মনুষ্যত্বকে বলি দিতে চেয়েছে।

কিন্তু আমার কাছে ঐ দুটোই যে বড়। নারীত্ব আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, মনুষ্যত্ব শিখিয়েছে ভালবাসাকে আবিষ্কার করতে। তাই, যারা আমার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করল না, নারীত্বের অধিকার তাদের কেমন করে বোঝাব? ওরা না বোঝে, না বুঝুক, আমি তোমাকে অস্বীকার করতে পারিনি।

কী করে অস্বীকার করি বল? সংসার যার সঙ্গে আমাকে সাতপাকে জড়িয়ে দিল সেই হল আমার আসল মানুষ, আর যার সঙ্গে শত-সহস্র পাকের বাঁধন, যাকে লাখ-লাখ যুগ বুকের মধ্যে রেখেও তৃপ্তি নেই, সেই হল রবাহুত, অবাস্তর, অর্থহীন। তাই যদি হবে, তাহলে সেই সমাজ-স্বীকৃত মানুষটির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কেন? সে তো আমার যৌবন-বনে মদমত্ত হাতির মত ঘুরে বেড়িয়েছে, আমার সমস্ত শতদলকে ছিন্নভিন্ন করেছে, তছনছ করেছে আমার সাজানো বাগানকে। আমার নগ্নতাকে বুভুক্ষুর মত গো-গ্রাসে গ্রাস করেছে। তবু তার ক্ষুধা মেটেনি, তবু তার তৃষ্ণা বহ্নিমান।

কিন্তু তুমি? তুমি শুধু দিয়েছ। নাওনি কিছুই। সমস্ত উজাড় করে দিতে গিয়েছি তোমাকে; তুমি কেবল একটু হেসেছ। তোমার দিকে চেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি বারবার। অতুল তোমার বিভব, রাজ-রাজেশ্বর তুমি। আমি দীনা। তোমার অকৃপণ প্রাচুর্যের দ্বারে আমার সমস্ত সত্তা দীন ভিখারীর মত লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। তোমাকে আমি কী দেব? তোমাকে কিছু দেওয়ার স্পর্ধা কেন আমার!

শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তখন আমার চোখে ফাগুনের রক্তমদিরা প্রভাত সূর্যের রঙিন আবেশে মাতোয়ারা; আমার মনের আনাচে-কানাচে অজানা শিহরণের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। শৈশবের অনুসন্ধিৎসায় যার দিকে প্রথম চোখ তুলে তাকালাম তাকে আমি কোনমতেই

আপনার জন বলে ভাবতে পারিনি। বরং কিছুটা সংশয়, কিছু বিস্ময়, আর কিছু ভয় সেদিন আমার মনকে সত্যিই বড় ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল।

পুজোর ছুটিতে গ্রামে এসেছিলাম বেড়াতে। বাড়ীর পাশেই রূপনারায়ণ। ভরা নদীর কূলভরা জল অবিরাম ধারায় বয়ে চলছিল। একপাশে তার অবারিত মাঠ ধানের অরণ্যে ডুবে গিয়েছে। আর এক পাশে শ্যামলতার রঙে ছোপানো দিকচক্রবাল। অপরূপ সে দৃশ্য। নৌকো চলেছে তর-তর করে। জাল ফেলে অজস্র জেলে-ডিঙ্গি মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে। নদীর বুকে অজস্র পাখীরা ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিল, বক, কাঁদাখোঁচা, মাছরাঙা, চক্রবাক, আর পানকৌড়ির দল।

রূপনারায়ণই ছিল আমার শৈশবের বিভীষিকা, কৈশোরের স্বপ্ন। এরই কূলে কূলে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কোন রকম আড়ম্বর ছিল না তোমার ছিল না কোন চটক। তোমার চোখের দ্যুতিতে ত্র্যম্বকের তৃতীয় নয়নের কোন দাহ ছিল না, ছিল পূর্ণিমার রজতবিভা। একটি অতি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের লীলায় রূপনারায়ণের কূলে রাখালের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে তুমি।

তোমার দিকেই চেয়েছিলাম। হঠাৎ কখন অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারপাশ। ভাবের দিগ্‌বলয় অতিক্রম করে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ছুটে এল বিভীষিকার জোয়ার। রাশি-রাশি, কালো-কালো সীমান্তহারা হাজার-হাজার অন্ধকারের ঢেউ তাল-গোল পাকিয়ে যেন আমাকে গ্রাস করার জন্যে দৌড়ে এল।

চারপাশে চেয়ে দেখলাম। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, ওপর-নীচে, চারপাশ থেকেই লাখ-লাখ দৈত্য-শিশুরা আমাকে নিঃশব্দে গ্রাস করার অদম্য উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছে। আমার চোখের আলো কখন যে নিভে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। কেবল রূপনারায়ণের বোটের ওপর একটা লাল আলো সেই অতলস্ত অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ এক ক্ষতের মত দগদগ করছে যেন।

হঠাৎ ভয়ের একটি তীক্ষ্ণ শিহরণ আমার সমস্ত শরীরটিকে কাঁপিয়ে দিলে। না, পৃথিবীতে আলো নেই, বাতাস নেই, দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় মাটিও বুঝি নেই। কান পেতে স্থবিরের মত বসে রইলাম। কোনদিকে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

হ্যাঁ, রয়েছে। সেই অন্ধকারের নিতল গহ্বর থেকে রূপনারায়ণেরই বোবা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—পালাও, পালাও।

সেদিন আর কিছু চিন্তা করার মত শক্তি ছিল না বলেই এক ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম বাড়ীতে। সামনে দিদিকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর ; ঘন-ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে আমি তখন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন : কী হয়েছে তোর ?

আমি নিবাক। কেবল দিদিকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিদি বললে : নদীর ধারে বেড়াতে গেছল ; ভয় পেয়েছে বোধ হয়।

বাবা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন : কতবার তোকে বারণ করেছি, নদীর ধারে যাবি নে একলা। একদিন সাপ-খোপে কাটলে তখন বুঝবে ; আর নয়ত শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে। কী হয়েছে বল !

ভীরু দুটি চোখ তুলে বললাম : ওরা তাড়া করেছে বাবা।

কারা ?

ঐ ওরা।

আবার ধমক এল বাবার কাছ থেকে : তুই পাগল না কি রে ? কারা বলবি তো ?

চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন : আজকাল এদিকটায় বড় চোর-বদমাইসের বাড়াবাড়ি হয়েছে। মুন্সী, বন্দুক নিয়ে আয়।

রাগলে বাবার খেয়াল থাকে না। তাই তাড়াতাড়ি বললাম : চোর নয় বাবা, অন্ধকার।

খিল খিল করে হেসে উঠল দিদি। বাবার প্রতাপ নরম হয়ে গেল। তিনি আমার দিকে একটু চেয়ে বললেন : তোর মাথা যে খারাপ তা আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। আর কখনও ওপাশে একলা যাবি নে, বুঝেছিস !

আমার জীবনে সেই প্রথম সংশয়।

তারপর বেশ কটি বছরের ব্যবধান। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ চষে বেড়িয়েছি, হোটেল-রেঁস্তোরা-পিকনিকে দাপাদাপি করেছি। অনেক আলো, অনেক অন্ধকার দেখেছি। কিন্তু সেদিন রূপনারায়ণের কূলে যে অন্ধকার দেখেছিলাম তাকে কোনদিন ভুলতে পারিনি।

আমার স্পর্শকাতর মনটিকে সে যেমন করে সেদিন নাড়া দিয়েছিল তেমনটি আর কেউ দেয়নি। আর তারই পটভূমিতে যে কিশোরটিকে দেখেছিলাম, তাকেই বা ভুলতে পারলাম কই? আমার শয়নে-স্বপনে, বিলাসে-ব্যসনে, আমার উদ্দাম কর্মমুখর দিনরাত্রির মাঝে হঠাৎ কখন-কখন সে হাতছানি দিয়ে চলে যায়। কোনদিনই তাকে ধরতে পারিনি বটে; তবু তাকে একেবারে অস্বীকার করারই বা সাধ্য কোথায় আমার?

সেবার আবার সেই গ্রামে হাজির হলাম। আমি, দিদি, বাবা। সেই রূপনারায়ণ, আর তার জলের আবর্তন, সেই দূরের বৃদ্ধ বট, আর যুবতী বনঝাউ। সেই অসংখ্য গেঁয়ো পাখি-পাখালির অশ্রান্ত কোলাহল, আর বিপুল মাঠের বুকে দিগন্ত-প্রসারি শূন্যতার আর্তনাদ।

এবারে আর শিশু নয়, কিশোরী। এবারে আর অনুভূতি নয়, বুদ্ধি আর বিচারের মাপকাঠি দিয়ে সব কিছু যাচাই করার প্রবৃত্তি। অনাগত যৌবনের জোয়ার আমার চেতনার তটভূমিকে স্পর্শ করার আকুল আগ্রহে ছুটে আসছে।

সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই আলো, সেই অন্ধকার। এরা কেউ অপরিচিত নয় আমার কাছে, কেউ পরদেশী আগন্তুক নয়। এদের ভিতর দিয়েই ঘুরে বেড়াই, কাশ আর বেনা-বনের ধারে ধারে, অশথ, বট আর পিপুল গাছের ছায়ায় ছায়ায়। সবই রয়েছে সেই আগের মত। শুধু তুমি নেই। সেই পাঁচ বছর আগেকার তরুণ কিশোরটিকে যে তখনও ঠিক তেমনি করেই মনে ছিল এ কথা সত্য নয়; তবু যে কিছু একটা ছিল, আজ তা নেই, এই অভাববোধটিই মাঝে-মাঝে আমাকে বিমনা করে তুলত।

অথচ বিশ্বাস কর, সে আমার সখের অভাব। ছেলেবেলায় যেমন সখের শিবঠাকুর গড়তাম, পুতুলকে ছেলে-মেয়ে সাজিয়ে ঘুম পাড়াতাম, এ-ও অনেকটা তেমনি। কিন্তু কেমন করে জানব, যে সেই সখই আমার জীবনে এমন চরম সত্য হবে দাঁড়াবে?

সেদিন হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আমার ঘুমে-জড়ানো চোখ দুটি চেয়ে রইল বাইরের বিপুল পৃথিবীর দিকে! সে এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি! আকাশ ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে আলোতে তার ভরে গিয়েছে চারপাশ। নদীর জলের উপর চিকন রূপালি ঢেউ ওপাশের বনঝাউ আর দেওদারের মাথায় হাল্কা হাওয়ার আলোড়ন।

সজাগ হয়ে উঠলাম। মনে হল, এই নিদ্রিত সুখসুপ্ত পৃথিবীতে দ্যুতিমান আকাশের নীচে বিস্তৃত কোন এলাকা জুড়ে যেন একটি সঙ্গীতের আসর জমে উঠেছে। একটি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বান দিগদিগন্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনন্ত বিরহের সৃষ্টি করেছে। স্থির হয়ে রইলাম। কিন্তু কই, কানের তন্ত্রীতে তো তার ঝঙ্কার নেই। তবু হৃদয়ের গভীরতম তারে তারই আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছে কেন?

সেই আবেদনটিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার জন্যেই বোধ হয় জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল তোমার ওপর। প্রথমে তোমাকে বুঝতে পারিনি। মনে হল, পাঁচ বছর আগেকার কোন একটি কিশোরের শিলোট যেন দীর্ঘ অন্ধকার ভেদ করে ধীরে ধীরে আলোর রাজ্যে মূর্তিমান হয়ে উঠছে।

বিশ্বাস কর, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। আর আমার সেই বিস্মিত অনুভূতির সামনে তুমি ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করলে। শিউরে উঠলাম। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, এতদিন ধরে যেন তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়?

এই অভিযোগ যেন আমার দৃষ্টির ভিতরেই লুকিয়েছিল, আর তুমিও তা বুঝতে পারলে। পেরেই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

কি লজ্জা? তোমারও কি এতটুকু সঙ্কোচ নেই? কিশোরীর এই নিশীথ অভিসার কেউ বরদাস্ত করবে নাকি? আর যদিও বা করে, নিজের দিক থেকেও তো একটা বাধা থাকা উচিত। না, নিজেরও কোন মর্যাদাবোধ থাকবে না? তুমি ডাকলে বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে? আমি কি একটা খেলা?

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। পাশে আমার দিদি ঘুমোচ্ছে। ওপাশের ঘরে বাবা। নিচের ঘরে চাকরের দল। সদর দরজা বন্ধ। ইচ্ছা হলেই কি এই কারাগার থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব? তুমি তো হাতছানি দিয়েই খালাস। আমি যাই কেমন করে বলত?

ভীরু চোখে তোমার দিকে চেয়ে দেখলাম। তোমার চোখের তারায় হাসির বিদ্যুৎ। ভীষণ রাগ হ'ল তোমার ওপর। তুমিই না রাধাকে এইভাবে পাগল করে দিয়েছিলে? নিজেকে সব সময় দূরে সরিয়ে রেখে কিশোরীর হৃদয় নিয়ে এ কী খেলা খেলে চলেছ তুমি?

তারপর ? কেমন করে, আর কখন যে আমার তরুণী-হৃদয়ের সমস্ত কিছু লোকলজ্জা, ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার কাছে হাজির হলাম তা একদিন হয়ত মনে ছিল, আজ আর কিছু মনে নেই। তোমার বিরুদ্ধে আমার সহস্র অনুযোগে যারা এতক্ষণ সঙ্গীণ উচিয়ে আমার চারপাশে পাহারা দিয়েছিল তারাও তোমার সান্নিধ্যে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। তুমি যেন সেই রাজার দুলাল। কতদিন যে তুমি আমার আঙিনার ওপর দিয়ে তোমার মুরলী বাজিয়ে চলে গিয়েছ, আমি বুঝতে পারি নি। অথচ তোমারই পায়ে আমার তরুণী-হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় উৎসর্গ করার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম আমি। কত দিন, কত যুগ !

আমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত তুমি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে যেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। জ্যোৎস্না রাতের সেই নিভৃত নদীতটে বনতুলসী শালুকের বনে বনে, কেয়া-কদমের ছায়ায়-ছায়ায়, কেতকী-হাসনাহেনার গন্ধে, চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহ কুজনের অন্তরালে আমার প্রথম ভীরু অভিসার। একটি পরিপূর্ণ আনন্দের জোয়ারে মিলনের উচ্ছ্বাস দুকূলহারা হয়ে আপনার তটরেখা অতিক্রম করে গেল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছিল জানি নে, হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। সেই শান্ত সমাহিত নিশীথের স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে তাল-গোল পাকিয়ে উঠল কোলাহল। চোখ মেলে দেখি, তখনও পূবের শুকতারাটি আমার প্রথম বাসরের শেষ দীপ হয়ে জ্বলছে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। দিদি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বাবা বললেন : ইস ; এই সাপের বাজো শ্মশানের পাশে পড়ে রয়েছিস তুই ? লোকগুলো গেল কোথায় ?

চারপাশে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম। প্রথম বাসর যাপনের ক্লান্তি তখনও নিটোল হয়ে বসেছিল আমার চোখের পাতায়। প্রিয় দয়িতের সঙ্গে একটি সুখরাত্রি যাপনের শিহরণ তখনও আমার শিরায়-শিরায় প্রতি লোমকূপে সঞ্চয়মান। তরুণী জীবনের সেই প্রথম প্রিয় অভিসার আমার চির-জীবনের একটি অমূল্য সঞ্চয়।

গলার হার, হাতের চুড়ি, কিছুই খোয়া যায়নি। যতই তাদের বোঝাতে চাই, ওগো, চোর আসেনি, আমিই চুরি করে পালিয়ে এসেছি, ততই তারা

দাপাদাপি করে। যতই বলি, ওগো, আমার এক মন ছাড়া কিছুই খোয়া যায়নি, ততই তারা হুঙ্কার ছাড়ে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওরা আসল চোরটিকে খুঁজে পেল না। তাই ধাওয়া করল নকল চোরের পিছনে। থানা থেকে দারোগা এল। আজকাল যে একদল অসামাজিক প্রাণী কিশোর-কিশোরীদের মোহাচ্ছন্ন করে অজানা দেশে পাচার করে নিচ্ছে তার একটি লম্বা ফিরিস্তি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সকলের সামনে পেশ করে দিলে, আর তার ঘ্রাণ আর দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় মিত্রী-বাড়ীর বাউণ্ডুলে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল।

কিছু একটা করতে পেরেছেন এই ভেবে, আর সোনার গহনা কিছু খোয়া যায়নি দেখে, বাবা কিছুটা হাঁফ ছাড়লেন। তবে সাবধানের মার নেই। অতএব পাহারা বসল আমার চারপাশে।

দোতলার জানালার পাশে আমি সন্ধ্যে থেকে চুপটি করে বসে থাকতাম। আমার সমস্ত শরীর জুড়েই যেন একটি পরিবর্ত্তনের ঢল নেমেছে। নিজেও বুঝি নে, অথচ দারুণ একটি অশান্তিতে যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলাম।

গভীর রাত্রে তোমার বাঁশী বেজে উঠত। ঘুমোতে-ঘুমোতে চমকে উঠতাম। বেরিয়ে আসতে চাইতাম ঘর থেকে। কিন্তু বেরোবার পথ নেই। চারিদিকে কড়া পাহারা। আবার ফিরে আসতাম জানালার ধারে। তুমি তখন দাঁড়িয়ে থাকতে, আর হাতছানি দিয়ে ডাকতে। আমি নিরুপায়ের আশাভঙ্গে সেই-খানেই ফুঁপিয়ে উঠতাম।

ডাক্তার এলেন। বদ্যি এলেন। নাড়ী টিপলেন, পিঠ ঠুকলেন, চোখ দেখলেন। না, কোথায় রোগ! ও রোগ দেহের নয়, মনের।

শেষ পর্যন্ত ওঝার ডাক পড়ল। অনেক ভেবে-চিন্তে ওঝা তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করলেন: নিশিতে পেয়েছে। ঐ বটগাছের ডালে বিশ বৎসর আগে একটি তরুণী আত্মহত্যা করেছিল। জ্যোৎস্না রাতে তারই প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় এ-অঞ্চলে। অতএব ও-দিকের ক-টা জানালা বন্ধ করে দাও।

ঝপ ঝপ করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। তোমাকে দেখার শেষ সুযোগটিও হারালাম আমি।

আবার আকাশ জুড়ে ঘন রাত নেমে এল। সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তুমিও এলে। চেতনার নাচ-দুয়ারে আমি তোমার নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতে পেলাম। কিন্তু তোমাকে দেখার কোন উপায় ছিল না আমার।

দিন আর রাত্রির কণ্টক শয্যায় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল আমার প্রাণ। মনে মনে তোমারই বিরুদ্ধে তোমার কাছেই নালিশ জানালাম। বললাম, হে নিষ্ঠুর, তুমি এই কারাপ্রাচীর ভেঙে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছ না কেন? তুমি কি কেবল কাঁদাতেই জান?

সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ তোমার ডাক এল। বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল। আকাশের তারায় তারায় প্রতিধ্বনি জাগলো তার। ওঠ, জাগ; আর কতদিন প্রতীক্ষা করে থাকব তোমার?

ব্যাকুল সেই ডাক। তোমার এই ব্যাকুলতা আর কোনদিন কানে আসেনি আমার।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম: দিদি, দিদি!

কি রে মীনু?

শুনতে পাচ্ছ?

কী?

ঐ, ঐ শোন। আমাকে ডাকছে ও।

দিদির চোখে-মুখে আতঙ্ক: কে ডাকছে? এত রাত্রে আবার কে ডাকবে তোকে?

আমি আকুল হয়ে বললাম: সে কি? শুনতে পাচ্ছ না? তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও। মাত্র একটিবার দেখা দিয়েই চলে আসব।

বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়তেই দিদি আমাকে ঝাপটে ধরে বললে: ছিঃ মীনু, লক্ষ্মীটি। ও ঝড়ো বাতাস। কিছু নয়। তুই শুয়ে পড়।

বললাম: না গো না। ও রোজই আসে আর ফিরে যায়। তুমিও তো ভালবেসেছ দিদি। আমাকে তুমি একটিবার ছেড়ে দাও।

দিদিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে কপাটের গায়ে ধাক্কা মারলাম। খুলল না দরজা। তারপর একটার পর একটা ধাক্কা। বাবা উঠলেন, চাকররা দৌড়ে এল।

আমি তখন মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে পাগলের মত কাঁদছি। লজ্জা, শরম, ভয়, কিছু নেই। থাকবে কেমন করে? মানুষ যখন শেষ পরিখায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে তখন তার জীবনবোধই বুঝি অপরের জীবন নিতে তাকে সামনে ঠেলে দেয়।

পরের দিনই আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর আর তোমাকে খুঁজে পাইনি। কলকাতার বিরাট জনারণ্য আর ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে তুমি নিজেকে বুঝি চির-নির্বাসন দিয়েছিলে।

তুমি তো নির্বাসন দিলে নিজেকে। কিন্তু আমি? আমার সেই রুদ্ধ-কারার দিনগুলি কি অসহনীয় ব্যথায় গুটি গুটি এগিয়ে চলেছিল জানতে কি? এখানে বান ডাকে না রূপনারায়ণের, আকাশ জুড়ে অন্ধকার নামে না। এখানে জ্যোৎস্নার বুকে চিতা জ্বালিয়েছে কর্পোরেশনের আলো। এখানে বন-তুলসী-কেয়াকদমের বালাই নেই, নেই চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহ-কূজন।

তবু যেদিন সন্ধ্যায় উতরোল বৃষ্টির গন্ধে আকাশের বুকে জলভরা মেঘেরা উদ্দাম হয়ে উঠত, তখন যেন মনে হ'ত আমি একা। এই বিপুল বিশ্বে আমার অন্তর শূন্য। তখনই মনে হ'ত, তুমি যেন কুবেরের অভিশাপে নির্বাসিত যক্ষ, বেদনার অগ্নিগর্ভে সুদূর রামগিরি পাহাড়ে বর্ষযাপন করছ। আর তোমারই দূত হয়ে আকাশের ঘন মেঘ বহু জনপদ অতিক্রম করে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। আমি আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকতাম তার দিকে যদি হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া তোমার কোন সংবাদ তার কাছে পাই—এই আশায়।

এই ভাবে চলত কতদিন কে জানে, হঠাৎ একটি ব্যতিক্রম ঘটল। দিদি ভালবাসার টানে ঘর ছাড়লো। অথবা, বাবা তাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করলেন। এর স্বপক্ষে বাবার যুক্তি নাকি অকাট্য। দিদির ওপর বাবার অনেকটা আশা ছিল। স্নেহ বল, সুযোগ বল, স্বাধীনতা বল, কোন দিক থেকেই দিদিকে বঞ্চিত করেননি তিনি। বাবা প্রায়ই গর্ব করতেন, তাঁর মত নিঃস্বার্থ স্নেহ এযুগে দুর্লভ। তাঁর স্নেহের ভাণ্ডারে ক্ষুদ্রতার মূষিক ঢুকতে পারবে না কোনদিন।

কিন্তু দিদি হঠাৎ বুঝতে পেরেছিল, এবং আমিও আজ পেরেছি, যে বাবার পর্বত-স্নেহ সেদিন মূষিককে বরদাস্ত না করলেও, তার মূষিক প্রসব করতে দ্বিধা হয়নি। তাই যদি না হবে তাহলে দিদিকে তিনি পরিত্যাগ করলেন কেন? দিদি ভালবেসে বিয়ে করেছিল। যাকে বিয়ে করেছিল তার পয়সা ছিল না। আর লোহার ব্যবসায়ী বাবার কাছে মানুষের চেয়ে লোহার দামটাই ছিল বেশী। অতএব বাবার পিতৃস্নেহের রাজ-সিংহাসন থেকে দিদি নির্বাসিতা হল। তবু এতদিন যে-স্নেহকে তিনি সুদুর্লভ বলে প্রচার করে এসেছিলেন সেই স্নেহের

লিপ্সা দেখে তাঁর পিতৃত্বের দম্ভ লজ্জা পেয়েছিল কি না জানিনে, তবে মনুষ্যত্ব যে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে স্বকীয় মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল এতেই আমি খুশী।

দিদির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হল।

মস্ত বড় ব্যাঙ্কার সমীরণ দত্ত। তাঁর হাতিও ছিল না, ঘোড়াও ছিল না। ছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি টাকা, আর গাদা-গাদা চাকর। তাঁরই ছেলে নবারুণকে বাবার প্রথম জামাই করার ইচ্ছা বহু দিনের। দিদির বদখেয়ালে বাবার মাথা হেঁট হল, আর তাই তিনি পুষিয়ে নিলেন আমার সঙ্গে নবারুণের বিয়ে দিয়ে।

নবারুণের জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারীর কোন দোষ নেই। যে-কোন মেয়েকেই বিয়ে করে সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর বাঁধতে পারত। তার অর্থ ছিল, প্রাণ ছিল, স্বাচ্ছল্য ছিল, পরিচয় ছিল। তবু সে আমাকে পেল না; আমাকে দিয়ে তার অভাব মিটলো না।

প্রথম রাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আজকের এই আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন, মীনু?

বললাম: ও তুমি বুঝবে না।

প্রথম মিলনের রাত্রে কোন স্বামীই স্ত্রীর কাছে এ-উত্তর আশা করে না। নবারুণও হয়ত তা আশা করেনি। কিন্তু আমি কেন তাকে সব কথা খুলে বলতে পারলাম না? কেন তাকে বলতে পারলাম না, আমি প্রোষিতভর্তৃকা। আমাকে তুমি ভালবেস না। প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিতে আমি অক্ষম।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাই লক্ষ্য করল, আমি কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছি। আবার ডাক্তার, বদ্যি, হাতুড়ের আনাগোনা সুরু হল।

বাবা বললেন: ডাক্তার-বদ্যি থাক, নবারুণ; একটু হাওয়া পরিবর্তন করে এস।

হয়ত হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল আমার। সত্যিই বড় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

ঘাটশিলায় এলাম হাওয়া পরিবর্তন করতে। সঙ্গে এল আমার দেওর রণেন। আমারই সমবয়সী। সকলের মধ্যে সেই হয়ত একটু বুঝত আমাকে।

রণেন বলল : বৌদি, এবার তোমার মুক্তি।

হেসে বললাম : তাই যদি হয়।

নবারুণ আমাদের বাধা দেয়নি; বরং রণেনের ওপর ঢালোয়া আদেশ দিয়েছিল, আমাকে নিয়ে অবিশ্রাম ঘুরে বেড়াতে।

আমিই অভিযোগ করেছিলাম : তুমিও চল।

নবারুণ হেসে বলেছিল : মাপ কর। তোমার ঐ পাহাড়-পর্বত নদী-নালা আমার ধাতে সইবে না। রণেনকেই সঙ্গে নাও। ও আজকাল কবিতা লিখছে, খোরাক পাবে ভাল।

রণেনও সায় দিয়ে বলল : থাক বৌদি। যে লোকটা ব্যালান্সশীট ছাড়া জীবনে আর কিছুই বুঝল না, তাকে পাহাড়ের গান কী শোনাবে! ও মেহনতে কাজ নেই। তার চেয়ে চল, আমরাই বেরিয়ে পড়ি।

তারপর কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল।

হঠাৎ একদিন তোমার ডাক এল আবার। শিউরে উঠলাম। যে-ডাক এতদিন প্রায় ভুলেই গেছলাম, সেই ডাক। যেন যুগ-যুগ প্রতীক্ষার পর হৃদয়ের বেদনানির্যাসে মাখানো সেই ডাক।

মরমে মরে গেলাম। ছিঃ ছিঃ, এতদিন তোমাকে ভুলে ছিলাম কেমন করে?

গভীর নিশুতি রাত্রে আবার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার পাশে দিকচক্রবাল পর্যন্ত জ্যোৎস্না তার রূপালি আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে। তারই মাঝখানে তুমি। তিন বছর আগে রূপনারায়ণের কূলে যাকে প্রথম পেয়ে হারিয়েছিলাম, সেই তুমি। চিনতে কোন ভুল হয়নি আমার।

তোমার শরীরে ক্লান্তি, চোখে-মুখে পথ চলার অবসাদ। অনেক পথ অতিক্রম করে, অনেক প্রতীক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে আবার তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাকে আমি ফেরাব কেমন করে?

আমার পাশে নবারুণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তুমি আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলে আমাকে। আমার বিশ্বাসঘাতকতায় মুখ ফিরিয়ে নাও নি তুমি। আমি যে তোমাকে ভুলে ছিলাম তার সব দায় আর দায়িত্ব যেন তোমারই।

কাঁধে কার যেন শীতল স্পর্শ। চমকে ফিরে চেয়ে দেখি নবারু

তুমি ?

নবারুণ একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল—তুমি যে আমাকে প্রত্যাশা করনি জানি। কিন্তু স্ত্রী যার নিশীথবিহারিণী তাকে একটু সজাগ থাকতেই হয়।

তার স্পর্শ রূঢ়, স্বর রূঢ়তর।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম বাড়ীতে।

তোমার ঐ বন্ধুটি কে ?

চিনবে না তুমি।

না চেনাটাই উভয়ত ভাল।

তারপর নবারুণের সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি।

পরের দিন আবার বেরিয়ে এলাম। দরজার কাছে আসতেই রণেনের সঙ্গে দেখা।

বলল : চল বৌদি।

তুমি যাবে ?

তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

না, না। এস।

দুজনেই বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

কিছু দূর যাওয়ার পর রণেন জিজ্ঞাসা করল : কোথায় যাবে বলত ?

ও যেখানে নিয়ে যাবে।

কে ?

ঐ যে দাঁড়িয়ে।

চারপাশে চেয়ে রইল রণেন ; তারপর বলল : কেউ তো নেই ?

বিরক্ত হয়ে বললাম : নেই ? ঐ যে দাঁড়িয়ে। আমাকে ডাকছে—তুমি যাও, যাও।

তুমি তখন ঐ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। মাথায় তোমার চাঁদের মুকুট। তোমার দেহের রূপালি দ্যুতিতে চারপাশ ঝলসে উঠেছে। তুমি দাঁড়িয়েছিলে তোমার সোনার রথে। কেবল আমার প্রতীক্ষায়, আমারই প্রতীক্ষায়।

আর কিছু মনে নেই। কেবল মনে হল, দুপাশের পৃথিবীর সব কিছু

সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। সামনের সহস্র প্রতিবন্ধকতা প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে আমাকে। পিছনে রণেনের ব্যাকুল আর্তনাদ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি। প্রতি মুহূর্তে তোমার আমার দূরত্ব কমছে। অথবা তুমি তোমার হাত দুটি বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। তারপর, কখন তুমি আমাকে রথে তুলে নিলে, মনে নেই আমার। শুধু শুনলাম, তোমার জয়রথের চক্র-নির্ঘোষ মেঘলোকে পাড়ি জমিয়েছে। কেবল তুমি, আর আমি। গভীর প্রসুপ্তিতে তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

আমার চারপাশে আজ এরা প্রহরী বসিয়েছে। আমি নাকি উন্মাদ! আমি হাসি। অথবা, এরাই ঠিক! উন্মাদ না হলে, তোমাকে পাওয়ার যোগ্যতা আমার থাকত না।

আর কোন দুঃখ নেই। না তোমার, না আমার।

অহল্যা

তোমাকে নিয়ে যে গল্প লিখতে হবে, এ-দুরাশা কোনদিনই ছিল না আমার। তবু কেন যে সেই দুরাশাটাই বারবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল তাই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি আজ। অথবা এ-ই বুঝি জীবনের ধর্ম। সময়ের পরিবর্তনে হৃদয়ের স্পর্শকাতর অনুভূতিগুলিও বিস্মৃতির পলিমাটিতে ভরে যায়। আর যায় বলেই বন্ধ্যা মাটির বুকেও একদিন নতুন ফসলের সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

সময়-ও কি নদী ?

তাই যদি না হবে, তাহলে তুমি আজ আমার গল্পের খোরাক হলে কেমন করে ? কোনদিন তো তোমাকে ঠিক এমনভাবে দেখিনি। দেখা তো দূরের কথা, চিন্তাও করতে পারিনি কোনদিন। তোমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার দিনে ব্রহ্মপুত্রের অশ্রান্ত জলকল্লোলের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যের শেষ দীপ্তিকে সাক্ষী রেখে একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে আজ আর রক্ষা করতে পারলাম না বলে ক্ষমা করো আমাকে। তখন ভাবিনি যে প্রতিজ্ঞা করলেই সব সময়ে তাকে রক্ষা করে চলার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। চলাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত লাভাকে এ পৃথিবী যদি পথ করে না দিত, তাহলে কী হোত বল ত ?

এ-তো গেল যুক্তির কথা। এ-ছাড়াও একটা কৈফিয়ত থেকে যায় আমার দিক থেকে। সেটি হ'ল মুক্তির কথা। আমি কি তখন জানতাম, সেই পাঁচ বছর আগে যে ধিক্কার আর ক্লীবত্বের পসরা মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, সেই জ্বালা আমার সমস্ত জীবন একটানা ছিছি-তে ভরিয়ে দেবে ? অপরের কাছে সুংসই সাফাই গাওয়াটা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয় ; কিন্তু যেখানে কোন রকম কারসাজি চলে না, সেই নিজের কাছে আমার জবাবটা কী ?

তোমাকে কোনদিনই আমার মনের কথা খুলে বলতে পারিনি। তুমিও তো পারনি। কিছু কুয়াসার আস্তরণ আমাদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল। কিছু গন্ধ, কিছু স্পর্শ, ইঙ্গিত আর ধ্বনিই ছিল আমাদের মন দেওয়া-নেওয়ার শ্বেত পারাবত। আজ এই দীর্ঘ ব্যবধানের ভাস্বরতায় সেই কুয়াসা কেটেছে,

সেই স্পর্শে অনুভূতির আবেগ শুনতে পেয়েছি। সেই আবেদন মুখর হয়ে বার-বার আমার কাছে অভিযোগ করছে: তুমি কিছু বল, তুমি কিছু বল। বিস্মৃতির ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় যে-মেয়েটি অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে কিছু অন্তত বল। হোক মিথ্যা, তবু চুপ করে থেক না।

আমার আত্মচেতনার সিংহদ্বারে এতদিন যারা আত্মম্ভরিতার সঙ্গীন উঁচিয়ে হাবসী সেনার ভয়াল মূর্তিতে পাহারা দিচ্ছিল, তারা কখন পরম নির্ভয়ে ঘুমোতে শুরু করেছিল, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার সুরক্ষিত দুর্গ আজ অরক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সচকিত হয়ে দেখলাম, আমার অচলায়তনের গবাক্ষ আজ উন্মুক্ত। এবং তারই ভিতর দিয়ে পাঁচশ মাইল দূরের একটি কুটিল রাত্রি তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আমার ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে, আর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাস আমার ক্লীবতাকে ধিক্কার দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে-ফেটে পড়ছে।

নিশ্চয়ই কিছু বলতে হবে আজ। এবং এ-ও জানি, সত্যের অপলাপ করা চলবে না এতটুকু।

যেদিন হোটেল প্যালেতে হঠাৎ কুমারসাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেদিন আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। অরণ্যের অন্ধকার কাটিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে ছোট হোটেলটি। সামনে দিয়ে ঢালাও সোজা পিচের রাস্তা চা বাগান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারই দুপাশে গভীর অরণ্যের মাতামাতি। চা-বাগানের পথে যাওয়া-আসার সময় সাহেবরা প্যালেতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দু'চার পেগ শ্যাম্পেন-হুইস্কি ওড়ায়, বিলিয়াড খেলে, স্টেকে তাস পেটায়। প্রয়োজন হলে, দু'চারদিন আত্মগোপন করে থাকারও বিশেষ অসুবিধা ছিল না সেখানে।

তবু ঠিক ঐ সময়ে, আর ঐ স্থানটিতে কুমারসাহেবকে আশা করিনি আমি। জায়গাটি পাহাড়ী, এবং সময়টি শীতের। সুতরাং বায়ু-পরিবর্তনের স্থান এ-টি নয়। কুমারসাহেবের যে আর্থিক আর সৌখীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে ঠিক ঐ রকম একটি বুনো জায়গায় তাঁর আবির্ভাব কেবল যে অস্বাভাবিক তাই নয়, যথেষ্ট বেমানানও বটে।

তা ছাড়াও একটা কথা রয়েছে। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম, সেই সময়েই তিনি মিলিটারিতে কমিশন নিয়ে ফিলিপাইনসের দিকে চলে যান। তারপর প্রাচ্যে অনেক ঘটনার সঙ্গে দুর্ঘটনাও ঘটেছে যথেষ্ট। অনেক

স্মৃতি ভারত আর প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবেছে : পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক নূতন দাগ দেখা দিয়েছে, কত পুরানো নাম যে ভুলে গিয়েছি তার আর শেষ নেই। দীর্ঘ অদর্শনের বিস্মৃতি-গহ্বরে যাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কুমারসাহেব অবি-সংবাদিতভাবে তাদেরই একজন। যুদ্ধ পর্ব সমাপ্তির পর নিয়তিশক্তি যাদের নিখোঁ-জের মধ্যে ফেলেছিলেন তাদের মধ্যে কুমারসাহেবকে স্পষ্ট দেখেছিলাম আমরা।

যাঁর সম্বন্ধে পনেরটি বছর কোন আশা রাখতে পারিনি, হঠাৎ এতদিন পরে আসামের ঐ পার্বত্য অঞ্চলের একটি অতি গোপন হোটেলে তাকে বসে হুইস্কি খেতে দেখে সেদিন তাই অতটা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটার পরেই কিন্তু ভেবেছিলাম, এ জিনিসটি একমাত্র কুমারসাহেবের পক্ষেই সম্ভব। ওঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জমিদার। বাবা ছিলেন বাহাদুর। পূর্বপুরুষের অর্জিত আভিজাত্য, আর পিতৃদেব-প্রচারিত-ইংরাজ মহিমাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি খদ্দর চাপিয়ে মহাত্মার ভক্ত সেজে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। আর যে মুহূর্তে আমরা কুমারসাহেবের ছত্রতলে কিশোরবাহিনী গড়ে ইংরাজদের সাগরপারে খেদিয়ে দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময়ে একদিন অকস্মাৎ শুনতে পেলাম তিনি কমিশন নিয়ে ভারত মহাসাগর থেকে জাপানীদের হটিয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রিন্স-অব-ওয়েলসের ডেকে উঠেছেন। যে সমাজ পরস্পরবিরোধী জটিলতার পীঠস্থান সেই সমাজে কুমারসাহেব আর একটি জটিলতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বসলেন।

প্রথমে চিনতে পারিনি আমি। রূপান্তর [illegible] অভিধানে যে একটি শব্দ রয়েছে সেটার এমন সার্থক প্রকাশ আগে আর কোথাও নজরে পড়েনি। যৌবনের সেই প্রথম যুগটিতে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের সুন্দর পুরুষ। লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, ঋজু, গৌরবর্ণ তনু, পরিমিত ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট, টিকালো নাক, প্রশস্ত কপাল, জোড়া ভ্রূ, প্রজাপতি ঢংএর গোঁফ, মুক্তোর মত চকচকে ঝকঝকে দাঁত। আমাদের কিশোর কল্পনায় তিনি তো একজন রীতিমত রোম্যান্টিক হিরো।

কিন্তু সেদিন যাকে দেখলাম রোমান্সের নামগন্ধ সেখানে নেই। বরং একটি অকৃত্রিম আরণ্য ভাব তার শিরায় শিরায়। কাঁচায় পাকায় একমুখ দাড়ি, গায়ের ওপর ভেড়ার চামড়ার মোটা কোট। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ, কুটিল। অথচ সমস্ত জড়িয়ে কিছুটা ক্লান্তিকর অবসাদ।

সু. ৩৬-২

একই টেবিলে মুখোমুখী বসেছিলাম আমরা। প্রথমে কেউ কারও দিকে নজর দিইনি। তারপর হঠাৎ কখন দুজনেই মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম দুজনেই দুজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হতভম্ব হয়ে বসে রয়েছি।

কুমারসাহেব নয় ?

আগন্তুকের মুখেও ভাবান্তর দেখা গেল। প্রথমে কৌতূহল, পরে বিস্ময়। সেই বিস্ময় কেটে গিয়ে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব।

অ-নি-ল ?

হেসে বললাম : অবিকল।

কুমারসাহেব চারপাশে একবার চেয়ে ফিস্-ফিস করার ভঙ্গিতে বললেন : চুপ। ও নামটা অনেক দিন পেছনে ফেলে এসেছি। আমি এখন ডি মেলো। আমার বাবা পর্তুগীজ আল্‌বক্‌র। মা আরাকানীজ।

আর একবার তাকিয়ে দেখলাম কুমারসাহেবের দিকে। পর্তুগীজ জলদস্যুই বটে।

হেসে বললাম : আমিও ডক্‌টর মুখার্জি।

ডাক্তার বুঝি ? তা এখানে কী করছ ?

চা বাগানে চাকরি করি।

কুমারসাহেব চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কিছুটা আত্মগত হয়েই যেন বললেন : ভালই হ'ল। আমি একজন ডাক্তারেরই খোঁজ করছিলাম। তুমি কি খুব ব্যস্ত এখন ?

না।

তাহলে চল না আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

বেড়াতে।

শ্যাম্পেন শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। তারপর বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা যে-পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করে সেই পথ ধরে দুজনে এগিয়ে চললাম। দুটি বছর ঐ অঞ্চলে কেটেছে আমার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়েই ঘুরে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু যে-পথ দিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা এগিয়ে চলেছিলাম, অরণ্যের সে-অংশটি আমার কাছে তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই ছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অরণ্য ঘন থেকে ঘনায়িত হচ্ছে, পাহাড়ের উপলে-উপলে পথ দুর্গম হচ্ছে ; জায়গায়-জায়গায়

অন্ধকার পাথরের মত জমাট বেঁধে গিয়েছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা কনকনে শীত। অস্বস্তিতে ভরে উঠল আমার শরীর। মনে হ'ল, যেন এক অদৃশ্য নিয়তি হাত ধরে একটি অজানা কুটিল অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মত চলার পর কুমারসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন; বললেন: এই আমার ডেরা।

প্রথমটায় লক্ষ্য পড়েনি; কারণ পথের দিশা তখন হারিয়ে ফেলেছি; মনের দুর্গম অরণ্যে তখন অনুভূতির শিশুগুলি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কুমারসাহেবের স্বরে চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখলাম, একটি প্রাসাদই বটে।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ভেতর থেকে একটি সচল আলোর রেখা চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপাট খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়ী মেয়ে।

কুমারসাহেব কোন কথা না বলে আমাকে সঙ্গে করে একটি ঘরে নিয়ে এলেন; বললেন, বস, ভয় নেই। আসছি এখনই।

আলো একটি নিশ্চয়ই ছিল সেখানে। না থাকলে সবই দেখলাম কেমন করে? কিন্তু কী দেখলাম? জায়গাটির চারপাশে দেওয়াল; মাথার ওপরেও ছাদ রয়েছে একটি। দেওয়ালগুলির কোনটিই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। বার্ধক্যে জীর্ণ। চারপাশে অজস্র ক্র্যাক। সেই ক্র্যাকের ফাঁকে-ফোঁকরে অসংখ্য লতাগুল্ম মনের আনন্দে বেড়ে উঠেছে। সেই স্তিমিত আলোতে পর্যবেক্ষণ করার মত শক্তি আমার ছিল না। তবু ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম, ছাদের একাংশ ঝসে পড়েছে। আর তারই ভেতর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে নীল আকাশের একটি অংশ অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটি বিশ্রী সোঁদা গন্ধে নাক ভরে উঠল। জোরে নিঃশ্বাস নিতেও রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল বোধ হয়। মনে হচ্ছিল, ও-ঘরের ভেতরে অনেক অপমৃত্যু ঘটেছে আর তাদেরই প্রেতাত্মা দেওয়ালে-দেওয়ালে কবরস্থ হয়েছে। সেই সব মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

কুমারসাহেবের পিছু-পিছু পাহাড়ী মেয়েটি হাজির হল। তার হাতে কিছু খাবার। সেগুলি টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল সে।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে কুমার-সাহেব বললেন: এখানে শ্যাম্পেন নেই। এই চালাও।

র-হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: অস্বস্তি লাগছে?

অস্বস্তির চেয়ে বরং উদ্বেগ বললেই ভাল হ'ত। কিছুটা কৌতূহলও যে ছিল না, তা নয়। তবু সেদিন বলতে হয়েছিল : না, তেমন কিছু নয়।

হুইস্কির গুণে, না, কুমারসাহেবের সান্নিধ্যের জন্যে, ঠিক মনে নেই আজ, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাজমেজে ভাবটা কেটেছিল আমার। পুরনো দিনের অর্ধবিস্মৃত কাহিনী নিয়ে গল্পও জমেছিল কিছুটা। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটলো। মনে হল, কোথা থেকে যেন একটি কাতর গোঙানি সেই অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি চিন-চিনে যন্ত্রণার সৃষ্টি হলে যেমন সমস্ত শরীরটাকে অবসন্ন করে ফেলে, এও যেন অনেকটা সেই রকম। রাত্রির সীমাহীন নির্জনতা, আর প্রাচীন প্রাসাদের স্থবিরতা আমার চেতনার ওপর হয়ত কোন দুঃস্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। মাঝে-মাঝে তাই বুঝি আমি চমকে উঠেছিলাম।

অথচ কিছু জিজ্ঞাসা করতেও বড় সংকোচ লাগছিল। আমি জানি, রাত্রির অরণ্য শব্দময়। তার নিজস্ব একটি রূপ রয়েছে, আবেদন আছে। তাকে বুঝতে পারি, ভালই। না পারি, চুপ করে থাক। প্রশ্ন করে উত্যক্ত করবো না।

কুমারসাহেব হয়ত আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে থাকবেন। তিনি সহজভাবে বললেন : আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার।

কী হয়েছে ?

ঠিক জানি নে। তবে মাঝে-মাঝে ওর ভেতর থেকে এই রকম গোঙানি শুনতে পাওয়া যায়। সমস্ত রাত ধরেই চলে, ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও আবার নিজের জগতে ফিরে আসে। চল না, একটু দেখবে।

কুমার সাহেবের পিছু-পিছু দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকলাম। একখানি খাট একটি ছোট টেবিল। এ-ছাড়া তৃতীয় কোন আসবাব নেই সে ঘরে। টেবিলের ওপর একটি আলো। সেই আলোতেই দেখলাম, খাটের ওপর একটি মহিলা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর দেহের ওপর একটি নীল চাদর বিছানো, মুখটি কেবল খোলা।

চমকে উঠলাম। এমন করুণ মূর্তি জীবনে বোধ হয় আর কোনদিন আমি দেখিনি। মনে হল, এ কিছুতেই জীবন্ত মানুষ হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভাস্করের নিপুণ হাতে গড়া শ্বেতপ্রস্তরের কারুকার্য।

ডাক্তারের দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। তোমার চেতনা
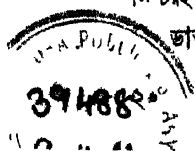
ফিরে আসেনি। তোমার অন্তরের নিভৃত তল থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি কেঁপে-কেঁপে অসহায় কান্নার মত মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসছিল কেবল।

কত দিন এমন হয়েছে ?

বছর খানেক হবে।

কোন চিকিৎসা হয়নি ?

না।

আমি একটু চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলাম : চিকিৎসা করাবেন না ?

কুমারসাহেব অবাক হয়ে বললেন : তা না হলে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন ?

বললাম : ওষুধপত্র কাছে নেই আমার।

কুমারসাহেব বললেন : তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। তোমার সময় মত চিকিৎসা করলেই খুশী হব।

ফেরার পথে আমাকে বললেন : তুমি যদি মাঝে-মাঝে আস তো ভাল হয়। আমি তো সব সময় থাকতে পারি নে।

কেন ?

অভ্যাস নেই, ডাক্তার। তাছাড়া অন্য কাজও রয়েছে। তাদের অবহেলা করতে পারি নে।

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলাম : তাহলে বিয়ে করলেন কেন ?

সেদিন সোজাসুজি কোন উত্তর দিতে পারেন নি কুমারসাহেব। প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন : আমার অনুপস্থিতিটা তোমাদের মেলা-মেশায় যেন বাধার সৃষ্টি না করে, ডাক্তার।

তারপরেই একেবারে পনের দিনের ব্যবধান। কয়েকটি জরুরী কাজে দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। কিন্তু সে-টা খুব বড় কথা ছিল না আমার কাছে। আজ আর বঞ্চনা করে লাভ নেই, সেদিনকার সবচেয়ে বড় কথাটা ছিল তোমার আকর্ষণ। মাত্র কয়েকটি কথা, আর কয়েক মিনিটের জন্যে অর্ধ-অচেতন তোমার সান্নিধ্য। এ দুটি তুচ্ছ ঘটনাই যে আমার কাছে এতবড় একটা তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে তা কি আগে ভেবেছিলাম কোন দিন ? ভাবতে পারিনি বলেই তোমার আকর্ষণের প্রথম ধাক্কাটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। নিজের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতেই

কলকাতায় ছুটেছিলাম। জরুরী কাজের কৈফিয়ৎটা ছলনা মাত্র। কিন্তু পারলাম না। শেষ পর্যন্ত হারই স্বীকার করতে হ'ল আমাকে।

কুমারসাহেব, তুমি, আর তোমাদের ঘিরে ঐ বর্বর অরণ্য। তিনটির কোনটিকেই পৃথক করে দেখতে পারিনি আমি। তিনটিই মিলেমিশে আমার চোখে একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিনই তোমার স্তিমিত চোখের পাণ্ডুরতা আমাকে সহস্র কাজের মধ্যে ডাক দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি এগিয়ে যেতে পারিনি। পা বাড়িয়েও অনেক বার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি। যতবারই পা বাড়াবার চেষ্টা করেছি ততবারই আমার আত্মম্ভরিতা সাবধান করে বলেছে: কুমারসাহেব নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন সত্যি; কিন্তু তাই বলে সে-নিমন্ত্রণ রাখার বাধ্যবাধকতা যে নেই, তা তুমিও যেমন জান, কুমারসাহেবও তেমনি জানেন।

হয়ত সত্যি। কিন্তু তুমি? তোমার ডাককে অবহেলা করি কেমন করে? আর অবহেলা করতে পারিনি বলেই সেদিন অপরাহ্ণের শেষ বেলাতে বেরিয়ে পড়লাম তোমাকে দেখতে নয়, তোমাকে আবিষ্কার করতে।

ভাগ্যের পরিহাসও বলতে পার। তোমাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে নিজেই কখন হারিয়ে গেলাম সেই দুর্গম অরণ্যে। একদিন রাত্রির অন্ধকারেও যে-অরণ্যে পথ হারাইনি, সেদিন অপরাহ্ণে সেই পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। অনেক ঝোপ-ঝাড়, খানা-খোঁদল-উপত্যকা পেরিয়ে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, দিনান্তের শেষ সূর্য ডুবে গিয়েছে। সমস্ত অরণ্য আচ্ছন্ন করে পঙ্গপালের মত অন্ধকার-শিশুরা চারপাশে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। নিথর, নিস্তব্ধ বনভূমি কিসের প্রতীক্ষায় যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ ভয় পেলাম। মনে হল, আমাকে কেন্দ্র করে এখনই হয়ত কোন নাটকের অভিনয় শুরু হবে; আর তারই জন্যে প্রস্তুতি চলেছে দিকে দিকে।

সেদিন সন্ধ্যায় কেমন করে যে তোমাদের ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম সেকথা আজ আর মনে নেই আমার। তবে এটুকু মনে রয়েছে যে, সেদিনকার সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তোমার ডেরার মশালের আলো দেখতে না পেলে কী হ'ত বলা যায় না। সেই প্রচণ্ড শীতেও আমার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরেছিল। চেঁচাতে গিয়ে নিজের স্বর শুনে নিজেই আঁৎকে উঠেছিলাম। সে-স্বর তো স্বর নয়; শুষ্ক কণ্ঠের বিকৃত আর্তনাদ মাত্র।

কু-মা-র-সা-হে-ব, কু·········

একবার, দু'বার। উত্তর নেই কোন।

দরজায় ধাক্কা দিলাম; একবার নয়, বার বার।

ডি মেলো, মিস্টার ডি·········

দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখলাম, সেদিনের সেই পাহাড়ী মেয়েটি।

মেয়েটিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকে এলাম। বাধা দেয়নি কোন-রকম। তার হাব-ভাবেও তেমন আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছু দেখলাম না।

মেয়েটির ঘাড় নড়ে উঠল। অর্থাৎ, নেই।

পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা আমার। একটু দাঁড়িয়ে বললাম : এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?

মেয়েটি আমাকে সঙ্গে করে সেই পুরানো বসার ঘরটিতে নিয়ে গেল। জল দিল। এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললাম জলটা। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই বিকৃত দেওয়ালগুলির দিকে। তারা যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছে। কুটিল দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসছে। কতদিনের কত ভ্রূকুটি ওদের পাঁজরায়-পাঁজরায় রুদ্ধ হয়ে বসেছিল কে জানে? সেদিন তারাই যেন সুযোগ পেয়ে আমাকে একেবারে চেঁকে ধরল। ভয় পেলাম; ভাবলাম, দৌড়ে পালিয়ে আসি। সেই রুদ্ধ কবরের প্রেত-দৃষ্টির বাইরে অরণ্যের মৃত্যু-কুহকও বুঝি অনেক কম ভয়ঙ্কর।

মিঃ ডি মেলো বাইরে গিয়েছেন।

আচ্ছন্ন ছিলাম বলেই বোধ হয় তোমার পদধ্বনি কানে আসেনি। আমি কেবল মুখ তুলে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। মনে হ'ল এত যুগ ধরে যে ভাষা নীরব হয়ে ঐ জীর্ণ দেওয়ালের শ্যাওলা-ঢাকা কফিনের তলায় লুকিয়ে ছিল, আজ সেই মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্বেত মর্মরের মত স্বচ্ছ তোমার চোখের দুটি তারা। ঐ চোখ দুটি দিয়ে সেদিন কি অতল জলেরই ডাক দিয়েছিলে তুমি?

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল। তোমার উত্তাপহীন, আকর্কশ, মৃদু কথার সুরে নিজের মধ্যেই ফিরে এলাম এক সময়। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, আটটা বাজে।

উঠে পড়লাম : তা' হলে আজ আর বিরক্ত করে লাভ নেই।

এত রাত্রে এখান থেকে একা যেতে পারবেন না আপনি। সঙ্গে দেওয়ার মত লোকও আমাদের নেই। আজ রাতটা এখানে কাটাতেই হবে আপনাকে।

কথার মধ্যে তোমার না ছিল আবেগ, আর না ছিল আসক্তি। যে-কোন মানুষ এই নিমন্ত্রণকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারত, নীতি অথবা শালীনতার দিক থেকে কিছুমাত্র অপরাধী মনে হ'ত না তাকে। আমি কিন্তু পারলাম না। সে কি কেবল বাইরের সেই নিস্তব্ধ অরণ্যানীর মায়াবী অনিশ্চয়তার ভয়ে? না, আর কিছু ছিল তার পেছনে?

মিঃ ডি মেলো আমাকে আসতে বলেছিলেন তাই· · ·

তবুও একটা কৈফিয়ত, আত্মপক্ষ সমর্থনের অকারণ প্রচেষ্টা। যদিও জানি, এ-কৈফিয়তটি অপ্রাসঙ্গিক এবং জলো।

তুমি বোধ হয় আমার অস্বস্তিটুকু লক্ষ্য করেছিলে; তাই বললে: মিঃ ডি মেলো আপনার সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন। এবং আপনি যে পথ ভুল করতে পারেন, সে-সন্দেহও আমাদের ছিল। তাই সন্ধ্যার পরেই দরজার বাইরে মশাল জ্বেলে রাখতাম। এত রাত্রে আপনি যদি একা ফিরে যান, তাহলে কিন্তু আমি নিজেই লজ্জায় মরে যাব।

তুমি বড় ভাব ছিলে মা-রীন। আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে সময় নিয়েছিলে তুমি। দীর্ঘ দিনের আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে হঠাৎ কখন কুয়াসা কেটে আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ল তা আমি বুঝতে পারিনি। অরণ্য যেমন তার গোপন রহস্য লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখে, তুমি কি তেমনি তোমার হৃদয়ের গোপন বারতাটি আমার কাছ থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলে?

তুমিও কি অরণ্য ছাড়া আর কিছু ছিলে না?

আমি ডাক্তার। তোমাকে নীরোগ করার ভারই ছিল আমার উপর। কিন্তু কখন আর কেমন করে যে প্রত্নতাত্ত্বিক মনটা আমার সমস্ত কিছু বানচাল করে দিল · কি ছাই আমিই বুঝতে পেরেছি? হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, তোমাদের বাড়ীটার মতই তুমিও একটি প্রত্নতত্ত্বের খনি। তোমাকে অস্বীকার করবো কেমন করে?

বিচিত্রময়ী তুমি।

ওপরে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ক্রমোন্নত অরণ্যানীর নিবিড় শ্যামলীমা, আর অনেক, অনেক নীচে টেরাই-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গল, এদেরই মাঝামাঝি একটি উপত্যকায় তোমার শৈশব আর কৈশোর কেটেছিল। সুদূর বাঙলা থেকে তোমার বাবা এসেছিলেন এখানে কাঠের ব্যবসা করতে। ছোট পাহাড়ী

জনপদ ; হাজার তুই মানুষের বাস। তাদের অনেকের মত তুমিও পাহাড়ের একান্ত নিজস্ব মানুষ ছিলে। হরিণ শিশুর দ্রুততার সঙ্গে তাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলধারার উজান বেয়ে, দেওদার-শালবীথির ব্যূহ ভেদ করে মনের মত্ত আবেগে তুমি ছুটে বেড়িয়েছ . বাধা দেওয়ার প্রয়োজনও কেউ কোনদিন অনুভব করেনি।

নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় বাহুল্য হয়ত ছিল না তোমাদের, কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাব আয়াস ছিল।

অকস্মাৎ সব তছনছ হয়ে গেল। একদিন অসংখ্য প্লেনের গর্জন শুনে তোমরা পুলকিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। তারই কয়েকটা দিন পরে পাহাড়ের উত্তর-পূব কোণ থেকে একদল সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে কদমে-কদমে এগিয়ে এল। মানুষগুলিব চেহারা বড অদ্ভুত। অদ্ভুত তাদেব পোষাক। মুখের চেহারা ভীষণ, চোখের দৃষ্টি কুটিল।

তোমাদের ঐ হাজার মানুষের জনতা হাঁ করে চেয়ে রইল তাদেব দিকে। না বুঝলো তাদের ভাষা, না বুঝলো তাদেব প্রয়োজন।

লোকগুলি হাত-পা নেড়ে, পাথরের ওপব বুটের গুঁতো মেরে, হায়নার মত চীৎকাব করে কী যেন বললো। তারপরেই বন্দুক ছুঁডতে শুরু কবলো। প্রতিরোধ এল না কিছুই। আকস্মিক হত্যার দাপটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পডলো সবাই। রক্তের নদীতে পাহাড়ের উপত্যকায় ঢল নামলো।

তুমিও লুকিয়েছিলে একটি পাহাড়ের ঢালুতে। সমস্ত দিন আর বেরোওনি। সারাদিন ধরে মাঝে-মাঝে পাহাড আর অরণ্য সেই শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রাত্রি আসাব সঙ্গে-সঙ্গে সেই শব্দ থেমেছে, কিন্তু রাত্রিব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। তোমাদেব জনপদের কাঠের বাড়ীগুলি আগুনেব লেলিহান শিখা দগ্ধ করেছে।

সমস্ত রাত্রি ধরেই সেই ধ্বংসলীলা তুমি দেখেছ। আর ভয়ে আঁৎকে উঠেছ। সকালে দেখেছ অন্য দৃশ্য। তোমাদের জনপদের কয়েক শ মানুষকে ওরা ধরে নিয়ে চলেছে। তাদের কোমরে-কোমরে শক্ত দডি দিয়ে বাঁধা। মাথা নিচু করে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে তারা। তাদের পেছনে অনেক গরু, ছাগল, ভাম, আর ভেডা। তাদের পিঠে তোমাদের সমস্ত বছরের খোরাক। দস্যুর দল আগের পথে ফিরে চলেছে।

তুমি চুপ করে থাকতে পারনি। চীৎকার করে উঠেছিলে। ফলে তুমিও বন্দী হয়েছিলে তাদের হাতে।

পুরো দুটি মাস তোমার ওপর অত্যাচার করেছে জাপানীরা। এই অকারণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারনি তুমি। কিন্তু একদিন রাত্রে ঘুমন্ত গার্ডের বুকে ছোরা বসিয়ে তারই রিভলবারটি কেড়ে নিয়েছিলে তুমি। তারপর তারই পোষাক জড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলে শত্রুপুরী থেকে।

যুদ্ধের কোন বিষয়েই উৎসুক ছিলে না তুমি। কিন্তু জাপানীদের ওপর তোমার একটি জাতক্রোধ জন্মেছিল। ফলে, সুযোগ পেলেই তোমার রিভলবারের সদ্ব্যবহার করতে তুমি ভোল নি।

তারই কিছু পরে হিরোসীমায় জাপানীদের ধ্বংস করলো আমেরিকা। জাপানীরা তখন আত্মগোপন করায় ব্যস্ত। ইংরাজরাও জাপানীদের পিছু নিয়েছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছে, সেখানেই গুলি করে মারছে। তাদের চাপে পড়ে তুমিও ছড়িয়ে পড়লে। কোথায়, তা তুমি নিজেও জানতে না। সেই থেকে তোমারও বারমাস্যা শুরু। তোমার সেই বহুবিচিত্র জীবনধারায় যখন যেটুক প্রয়োজন বলে মনে করেছ, তা করতে পিছপাও হওনি তুমি। অথচ জীবনের দুর্দান্ত স্রোতকে ফেরাতে পারনি, কোন ঘাটে ভেড়ে নি তোমার তরী।

এমনি ভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন একটি দৃশ্য দেখে দাড়িয়ে গেলে তুমি। পাহাড়ের পাশে জাপানী পোষাকপরা একটি লোক শুয়ে রয়েছে। গায়ে তার শতছিন্ন পোষাক। প্রতিহিংসার আগুন তখনও তোমার বুকে নেভেনি। রিভলবারটি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে। একভাবে দেখলে। তারপর কী জানি একটা সন্দেহে তুমি চুপি চুপি এগিয়ে গেলে।

লোকটির মধ্যে প্রাণের কোন সাড়া নেই। মুখ গুবড়ে পড়ে রয়েছে। কৌতূহলে তার পাশে গিয়ে নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়নি তখনও। মুখটাকে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুরিয়ে দিতেই লোকটি অসীম ক্লান্তিতে চোখ খুলে বললে : জল।

না, জাপানী নয়। বাঙালী। পাশের ঝরনা থেকে দৌড়ে গিয়ে জল এনে মুখের কাছে ধরলে তার; ঝোলা থেকে কিছু শুকনো খাবার দিলে তাকে; লোকটি গোগ্রাসে শেষ করল সব।

কুমারসাহেবের সঙ্গে সেই তোমার প্রথম দেখা। দুজনেই ভাগ্যের হাতে চাবুক খেয়ে জর্জরিত। তোমরা কেউ কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারনি।

ঝড়ের রাতে নীড় বাঁধলে দুজনে। ভেবেছিলে, অনেক ঝড়ের পর আর

বুঝি আকাশে মেঘ জমবে না। কিন্তু ঝড় আবার উঠলো। তবে এবার আর বাইরের জগতে নয়, তোমার মনের জগতে।

সীমান্তে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের ফলে বর্মা পুলিশ কুমারসাহেবের পেছনে তাড়া করলো। তোমরা পালিয়ে এলে এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে। কিন্তু কুমার-সাহেবকে ধরে রাখতে পারলে না।

আবার তুমি একা। বিপদ, শারীরিক ক্লেশ আর অনিশ্চয়তার চেয়ে যে নিঃসঙ্গতা মানুষের বড় শত্রু, একথাটা বোধ হয় এখনই তুমি বেশী করে বুঝেছ। একদিন জাপানী বর্বরতার বিরুদ্ধে তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছিলে, আজ অনাবিল নিঃসঙ্গতা তোমাকে কারারুদ্ধ করেছে।

আর ঠিক সেই সময়েই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম : তোমার নাম মা-থীন রাখলো কে ?

আমার দিকে বড়-বড় দুটি চোখ মেলে একটু হেসে তুমি বলেছিলে : ইচ্ছে হলে অহল্যা বলেও ডাকতে পার আমাকে।

কিন্তু তোমায় মুক্তি দেবে কে ?

আমার হাতের ওপর তোমার হাত রেখে বলেছিলে : কেন ? তুমি !

বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না মা-থীন, সেদিন তোমার কথা শুনে আমার শরীরে রোমাঞ্চ জেগেছিল। আমার ওপর এতখানি গুরুদায়িত্ব আর কেউ কোনদিন দেয়নি। আমি কি সত্যিই তোমার বিশ্বাসের যোগ্য ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে ?

হ্যাঁ।

যদি না পার ?

সে দোষ আমার, তোমার নয়।

আর কুমারসাহেব ?

আমার জন্যে কোনদিনই তাঁর কোন অভাব হয়নি।

যদি হয় ?

তুমি একটু হেসে বলেছিলে : বড় সন্দেহপ্রবণ তোমার মন।

আমিও সেদিন হেসে উত্তর দিয়েছিলাম : প্রেম চিরকালই পাপশঙ্কী, মা-থীন।

সেদিন বাংলোতে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মনের এমন একটি নিবিড় আত্মীয়তা জন্মালো কেমন করে ? মনের

ভেতর দুজনেই হয়ত একই নিঃসঙ্গতার জ্বালা অনুভব করেছিলাম। অথচ আমি জানি, আমাদের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী। তুমি চেয়েছিলে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করতে, আমি চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। তুমি চেয়েছিলে মুক্তি, বন্ধনের অবলুপ্তির দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম আমি।

কুমারসাহেবকে ভালবাসতে পারনি তুমি। কুমারসাহেবের নিটোল উদাসীনতা তোমাকে ব্যথা দিয়েছিল, তোমার বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ব্যর্থতার পাষাণ ফলক। তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তুমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে মানুষ তোমাকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগ দেয় নি, সে বোধ হয় সমুদ্রের জল ছাড়া আর কিছু নয়। কোন দাগই কাটে না তার বুকে। তুমি বুঝেছিলে কুমারসাহেবের নিত্যপ্রয়োজনের তালিকায় তোমার নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে।

তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। যদি কোনদিন তার ডাক আসে, তাকে 'না' বলে ফিরিয়ে দেবে কেমন করে? এ বিষয়ে তুমি কোন চিন্তাই কর না। অথবা করলেও, ঠিক করতে পারনি কিছু। সত্যিই তো, মানুষ কি কেবল ভবিষ্যতের প্রত্যাশাতেই দিন গুনে যাবে?

তবে তাই হ'ক আজ। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি আজ মত্ত হয়ে আমাদের মিলনের পথে দাঁড়ায়, আমরা তাকে প্রতিরোধ করব। তোমাকে আমি মুক্তি দেব অতুল্যা।

তার পরের কটা দিনই আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। জীবনের সেই তিরিশটা বছর অন্ধকার কারাগারে বাস করে হঠাৎ যেন একটি ভাস্বর দিনের মধ্যাহ্নে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মনে-মনে অস্থির হয়ে পড়লাম। যেন অনেক কিছু করার রয়েছে, করা হয়নি কিছু এখনও, এই মুহূর্তে সব কিছু করে ফেলা উচিত। কাল সকালেই আমরা এই পার্বত্য উপত্যকা ছাড়বো। আজ সমস্ত রাতই আমার প্রতীক্ষায় তোমার প্রাসাদের ওপর মশাল জ্বলবে। আজ আর পা হারালে চলবে না আমার।

বকেয়া কাজ মিটিয়ে ফেলতে একটু সময়ই লেগেছিল। সব সেরে সন্ধ্যার অনেক আগেই জিপ নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লাম, তখন আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। মনে হ'ল, একটা উদাসীন হালকা হাওয়া আমার আমিটিকে ভাসিয়ে দিয়েছি, ছড়িয়ে দিয়েছি চারপাশে। আজ আর কৃপণের মত কোন

কিছু সঞ্চয় করা নয় ; কেবল বিলিয়ে দেওয়া। মনে হ'ল, আমার হৃদয় আজ অক্ষয়, অফুরন্ত আমার ভাণ্ডার। আর সেই তুলনায় পৃথিবীতে বড় বেশী দারিদ্র্য, বড় বেশী শূন্যতা।

বনপ্রান্তে জিপটিকে দাঁড় করিয়ে কীট ব্যাগটি নিয়ে বনের পথ ধরলাম হঠাৎ দেখি, কুমারসাহেব বসে রয়েছেন একটি পাথরের টিলার ওপর। ক্লান্ত, অবসন্ন তিনি।

পুরো ৬টি মাস পরে ফিরে এসেছেন কুমারসাহেব। তাঁর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : কী হয়েছে আপনার পায়ে ?

কুমারসাহেব আমার মুখের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললেন : ও কিছু নয়।

কিছু নয় ? কী বলছেন ? পা দিয়ে অত রক্ত পড়ছে কেন ?

রক্ত !

একটু যেন বিব্রত হলেন কুমারসাহেব। তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে দেখলেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সত্ত্বেও রক্তকে আটকানো যায়নি। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা ফুলে উঠেছে।

বন্দুকের গুলি লেগেছে।

কোথায়

বর্মা সীমান্তে।

কেন ?

হত্যা করা মানুষের নেশা, ডাক্তার। ওর পেছনে কোনদিনই কোন কারণ থাকতে পারে না।

সঠিক বুঝতে না পারলেও, অনুমান করলাম। বর্মা সীমান্তের মোহ তিনি এখনও ছাড়তে পারেন নি।

আপনার মোহ ফুরিয়েছে ?

কুমারসাহেব একটু হেসে বললেন : মোহ নয়, প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল, লোকটি কেবল নিষ্ঠুরই নয়, যথেষ্ট দাম্ভিকও বটে। এ জগতে কারও যেন কোন প্রয়োজন রয়েছে ? সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি সবই তো অপ্রয়োজনের বোঝা, আলস্যের নিষ্ফল সঞ্চয়। কেবল নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একাকার করার অপচেষ্টা মাত্র।

কী করবেন এখন ?

বাড়ী যাব; তারপর, বেঁচে যদি থাকি, মা-খীনকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। ও একদিন আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ওরই হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম এবার।

একটি দেহাতি লোক হাজির হল। তারই কাঁধে ভর দিয়ে কুমারসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

তুমিও এস, ডাক্তার। তোমার ওপর যে ভার দিয়েছিলাম, তা তুমি পালন করেছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

হঠাৎ কে যেন একটা চাবুক কষিয়ে দিল আমার মুখের ওপর। ভাবলাম, সেই নির্জন বনপ্রদেশে একটা রিভলভারের গুলি খরচ করাটা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়; কিন্তু করতে পারলে হয়ত······

এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আপনি এগোন। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

লোকটির কাঁধে ভর দিয়ে কুমারসাহেব ধীরে ধীরে বনপথে অদৃশ্য হলেন। আমিই কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম একা। প্রাক সন্ধ্যায় গাছে-গাছে পাখিদের অশ্রান্ত গুঞ্জন জেগে উঠেছে। কিছু দূরে ব্রহ্মপুত্রের কলনাদ শুনতে পাচ্ছি। কোথা থেকে যেন একটা পিপাসার্ত পাখির করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। আকাশের শেষ সূর্য ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

জীপের মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

আশা করি, তোমার মুক্তি হয়েছে, অহল্যা। তোমার পাষাণ-ভার আমি সেদিন নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছিলাম। আমার কি মুক্তি হবে না কোনদিন?

অনেক সময় মনে হয়, মানুষ বুঝি প্রকৃতির একটি বেওয়ারিশ সৃষ্টি। সৌরজগতের বিধিবদ্ধ কোন-কিছু নিয়ম-কানুনই সে মানতে রাজি নয়। জোর করে মানাতে গেলেও তার বিপদ অনেক। আকাশের বুকে হাজার-হাজার লাখ-লাখ, কোটি-কোটি নক্ষত্রের মত মানুষের এ-মনও বুঝি বা অযুত বিস্ময়ে ভরা। বিস্ময়, চমক। আর তার সঙ্গে অতৃপ্ত বাসনা-কামনার একটা জ্বালা-ও বটে। এই জ্বালা তার অবচেতন মনের প্রাণময় অংশটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করে না। এই বোধহয় মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি।

অথবা এ-পান্থশালায় সমস্তটাই বুঝি পড়ে-পাওয়া চোদ্দআনা। যা পেলাম, সেটকু না পেলেও কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। যা পাইনি, তা পেলেও হয়ত জীবনের চাহিদা মিটতো না। যা পেলাম, যতটুকু পেলাম—তার বেশী আর কিছু চাইব না—এইটাই জীবনের সহজতম সুর। অথচ আপোষহীন কী একটা দারুণ উত্তেজনা আশাভঙ্গের চোরাবালীতে আমাদের দিন-দিন, প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে। আমরা তুবছি। জানি, মুহূর্তমাত্র পরেই আমাদের অস্তিত্বের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত বিস্মৃতির চোরাবালির গোপন স্তরে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে। আমাদের মাথার ওপর উৎক্ষিপ্ত বালির স্তর নির্বিবাদে আপনার গুহামুখ বন্ধ করে ভোজনক্লান্ত অজগরের মত ঘুমিয়ে পড়বে। তবু আমাদের চেতনা নেই। যযাতির মূর্খতার আমাদের কামনার চিতা চির-বহ্নিমান।

তাই যদি না হবে, তাহলে তোমাকে আজ এই চিঠি লিখতে বসব কেন? মান অভিমান-অভিযোগ মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধের নাকি সজাগ প্রহরী। ভুলে যেয়ো না, প্রেম-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা হঠাৎ একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস। বিবর্তনবাদের ধারাবাহিকতার প্রায় শেষ সীমান্তে মানুষের যে প্রিলোট দেখতে পাও সেটা আর কিছু নয়, সমাজনিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের একটি চরম অবমাননা। যাযাবর থেকে ট্রাইব, ট্রাইব থেকে ক্ল্যান, ক্ল্যান থেকে

সমাজ। বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস আজ বুঝি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তারই তটভূমির ওপর যুগ-যুগান্তের অট্টহাসি কালের কুটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান। এ তরঙ্গের বেগ রোধ করবে কে? কেউ না। না তুমি। না আমি।

তাই অতীত আর পঙ্গু শরীর দুটোই আমার কাছে সমান। দুটোকেই আমি খরচের খাতে ফেলে দিয়েছি। না দিলে জীবনের কাছে হার স্বীকার করতে হ'ত আমাকে। কিন্তু কোন কিছুর কাছেই হার স্বীকার করাটা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে। তাই যেদিন তোমার কাছে আমি চরম আঘাত পেলাম সেদিন, আজ অস্বীকার করে লাভ নেই, হঠাৎ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। একটা অবিশ্বাস্য আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়লে মানুষ যেমন হঠাৎ জড় হয়ে যায়, সেদিন আমার শিরা-উপশিরাগুলি যেন তেমনি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ-কথাটাও তুমি বিশ্বাস করো না যে আমার সেই মানসিক আর তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে শারীরিক জড়ত্ব খুব বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। আমার আত্মসম্মানই সেদিন আমাকে [illegible] মুক্তি দিয়েছিল। তিল-তিল করে যা গড়েছিলাম, মুহূর্তে তারেই ভেঙে-চুরে শেষ করে দিয়েছিলাম। আমার সমস্ত মুখর অতীতকে মূক করে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় খরস্রোতা হয়ে উঠেছিলাম সেদিন। সে-কাঁপন [illegible] বাতের লতার মত নয়, কালবৈশাখীর ঝড়ে উন্মত্ত [illegible]। সেদিন তোমার ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষই ছিল আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র পাথেয়।

কিন্তু আজ

আজ হঠাৎ নবনদার আকাশ ছেয়ে গেছে। নিজেকে [illegible] আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। অন্ধকারের [illegible] হঠাৎ রাশি-রাশি আলোর রাজ্যে ঢুকে পড়লাম যেন। কালো-কালো জল-ভরা মেঘ। সমুদ্রের ছায়া ওদের বুকে। একটু পরেই হয়ত বর্ষণ শুরু হবে। হোক। আমার চোখে আজ জল নেই। ঈশানের মেঘের মতই আমার মন-মনক্ষ [illegible] অতিক্রম করে মেঘরাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

বিশ্বাস কর, আমার চোখে আজ জল নেই। মনে নেই বিষাদের কোন কালো মেঘ। উত্তর-বৃষ্টির ধোয়া-মোছা রঙিন দিগন্তের নেই কোন সমারোহ। কোন রিক্ততা, কোন বৈরাগ্যের নির্লিপ্ততা আমার মনকে আজ ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারেনি।

জানি নে, এটা আমার স্নায়ুর অবসাদ কিনা। কতক্ষণ যে আকাশে-বাতাসে মেঘলোকের এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিটিকে আত্মার আত্মীয় করে রাখতে পারব, তাও আমার কাছে সমান অজানা। হয়তো এর সবটাই ক্ষণিক। তা হোক। তবু এই মুক্তির আনন্দকে কিছুতেই অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছি নে।

একদিন আমার চোখে রঙিন নেশা ছিল। রক্তে ছিল মাদকতা। উদগ্র সুরার মত তা জ্বালাময়। তুমি ছিলে পোস্টগ্রাজুয়েটের সেরা দাম্ভিক ছাত্র। প্রফেসরদের খুশী করতে তুমি। মন দোলাতাম আমি। তুমি ছিলে পড়াশুনায় কৃতী। মোটর চালনায় আমার কৃতিত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তুমি আসতে কাপড়ের ওপর একটা পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে। আমি আসতাম নিত্য ফ্যাশনের ঢেউ তুলে, বিশ্ববিদ্যালয় সরগরম করে। তুমি থাকতে মির্জাপুরের একটা মেসে। আমার বাবার ছিল বিরাট প্রাসাদ। মোজাইক করা চারতলা বাড়ীর মেঝে ছিল স্টাকো দিয়ে পালিশ করা। দম্ভ থাকার কথা ছিল আমারই।

অথচ তোমার কাছে আমার সব কিছু হারিয়ে ফেলতাম কেন বল তো! বন্ধুরা হাসত। কেউ কেউ কটাক্ষ করত। কেউ বা পেছনে রটাত কুৎসা। বাবা-মা রাগ করতেন। আত্মীয়-স্বজনে টিটকারি দিতেন। আমি বিস্ময়ে অবাক হতাম। পুরুষ-বন্ধুর অভাব ছিল না আমার; লঞ্চ, ডিনার, নাচ— কোন কিছুতেই অরুচি ধরাতে পারত না কেউ। আমি নিজেও বুঝতে পারতাম না, কেমন করে, আর কিসের জন্যে, তোমার কাছে নিজেকে অমন করে বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

কী ছিল তোমার মধ্যে?

রূপ? থাকে থাক। তা নিয়ে মুগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না আমার। কারণ রূপের জৌলুষ থাকার কথা আমাদের। আমার বাবা ছিলেন কলকাতার বনেদী বড়লোক। আমার দাদামশায় ছিলেন আরও বেশী বনেদী। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ছিলেন লর্ড হেস্টিংস-এর ব্যানিয়ান। ইংরেজ প্রভুদের চাহিদা মিটিয়ে নিজে যা রোজগার করে গিয়েছেন তার পরিমাণ অনেক। তাঁর অধঃস্তনেরা সেই অর্থ বাক্সবন্দী করে রাখেননি। কেউ বাড়িয়েছেন; কেউ বা কমিয়েছেন। বনেদীয়ানার কৌলিন্যই নাকি এইখানে। কামনার অতৃপ্তি তাঁদের রুচিকে গর্হিত করেনি। সুন্দরী নারীর সওদা করতে তাঁদের মত নির্মম আর দক্ষ সওদাগর পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও কেউ রয়েছেন কিনা জানিনে।

আমার সত্তর বছরের দাদামশায়ের কাহিনী জান? তিনি যাচ্ছিলেন নৌকোয় চেপে জমিদারী দেখতে। নদীর ঘাটে লক্ষ্য পড়ল একটি নাবালিকার ওপর। অপরূপ সুন্দরী। চোদ্দ বছর বয়স তার। খবর পেলেন মেয়েটি পাশের গাঁয়ের একটি দরিদ্র পূজারীর। পাইক ছুটল ব্রাহ্মণের খোঁজে। নিয়ে এল বেঁধে। জ্ঞানী, দুঃস্থ, সৎ ব্রাহ্মণ। এ-অপমানে সেদিন তাঁর চোখ ঝলসিয়ে আগুন বেরোয়নি, ছাপিয়ে ঝরেছিল জল।

টাকার ভাপে সেদিন দাদামশায়ের মনুষ্যত্ব হয়ত সত্যিই উবে গিয়েছিল। না গেলে এক মুঠো টাকার দামে মেয়েটিকে সওদা করতে চেয়েছিলেন কেন? দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সেদিন কিন্তু টাকার লোভে নিজেকে হারালেন না। যা হারালেন তার দাম অনেক অনেক বেশী, মেয়ে।

ঠিক দুটি বছর পরে দাদু মারা গেলেন। একটি মাত্র মেয়ে, ষোল বছরের ভরা যৌবন আর সৌন্দর্য, আর তাদের চেয়েও অকরুণ হিমালয়ের মত নিরেট দীর্ঘ ভবিষ্যৎ নিয়ে দিদিমা বিধবা হলেন।

আমার রূপের কাছে তুমি দাঁড়াবে কেমন করে?

রূপ, পয়সা, আভিজাত্য—কোনটাই তোমার ছিল না। অন্তত, আমার মত। ছিল তোমার দম্ভ। আর সে দম্ভ তোমার অভ্রভেদী। দম্ভের রেডিয়ম তোমার সর্বাঙ্গ থেকে ছিটকে বেরিয়ে সামনে যাকে পেত তাকেই দগ্ধ করে মারত। হাঙরের দাঁতের মত চিক্কণ ধারালো তার দাঁত।

তুমি কি আমাকে অজগরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে আকর্ষণ করেছিলে?

তুমিও কি অজগর?

সংসারে সকলের কাছ থেকেই যখন ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কিল হজম করছি তখন আমার একমাত্র বন্ধু ছিল অনিতা। সেই নম্র, ভীরু মেয়েটি। বড় বড় ডাগর দুটি চোখ। ঠোঁটের ওপর মিলিয়ে যাওয়া হাসি। উত্তেজনা নেই আকর্ষণ নেই। জৌলুষ নেই। রূপ? তাই বা কোথায়? অত্যন্ত সাদা মাটা। কখনও কড়া কথা বলতে পারত না কাউকে। অত্যন্ত সাধারণ।

হয়ত সেই জন্যেই তার সঙ্গে আমার অতটা মিলতো।

হঠাৎ একদিন কী জানি কেমন করে আমার মনের কপাট একটু আলগ হয়ে গেল অনিতার কাছে। বেশ বুঝতে পারলাম, ও একটু আঁতকে উঠল তোমার ওপর আমার যে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল সেটা ওর না-জানার কথা নয় কিন্তু কোনদিন ও আমায় এতটুকু সাবধান করেনি। লক্ষ্য করলাম, ঝড়োরাতে

বিদ্যুতের মতই ওর মুখের বিকৃতি চকিত, ক্ষণস্থায়ী। আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে একটু চেয়ে রইল ও। সেদিন বুঝতে পারিনি। আজ এতদিন পরে ওর সেই বড়-বড় চোখ দুটির করুণ আবেদন অতলান্ত সমুদ্রের ভাষা নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

মাত্র একটু হাসল অনিতা। বলল, সে কী রে?

কেন? দোষটা করেছি কোথায়?

দোষ নয়। ভুল।

আমাকে স্তম্ভিত করে দৃঢ়কণ্ঠে সে আবার বলল: ভুলই করেছিস তুই।

আবার একটু হাসল অনিতা। মুক্তোর মত চকচকে ধাবাল দাঁতের পংক্তির ওপর সে-হাসি ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শারীরিক আর মানসিক গতিতে আমি চিরকালই একটু উদ্দাম, একটু বেশী বলা চলে।

বিরক্ত হয়ে বললাম: হাসছিস কেন বল!

এবার সে আর হাসল না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল: কেন মরতে গেলি?

বাবা শেষ কথা জানিয়ে দিলেন: আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে তোমার বিয়ে।

তা জানতাম। পাত্রও ঠিক করেই রেখেছিলেন বাবা। কলকাতার নবীন ব্যারিস্টার উদীয়মান শেখর ভট্টাচার্য। বিরাট বাড়ী। গাড়ীও ক-খানা। কলকাতার উচ্চ সমাজের শোকেসে বৈদুর্যমণি।

মা ছলছল চোখে বললেন: তোর এত বড় বন্দবটাকে তুফানে ভাসিয়ে দিলি রে? মেয়েছেলের জীবনে এই বিয়েটাই হল বিপজ্জনক। এর ঝক্কি তুই নিজের মাথায় কিছুতেই নিস নে মা।

সেই দিনই প্রথম ভয় পেলাম। দ্বিধা এল, দ্বন্দ্ব এল। আর এল আশঙ্কা। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা মনকে ভাবাক্রান্ত করে তুলল। এতদিন একটি প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে দুর্নিবার বেগে দুকূলহারা হয়ে ছুটে চলেছিলাম। মায়ের আশংকাই প্রথম জোরালো বাধার সৃষ্টি করল তাতে।

কিন্তু তবুও পিছিয়ে পড়লাম না। ঠিক সেই দিন রাত্রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তুমিও এলে। অথবা আমার প্রবল উচ্ছ্বাসে নিজেকে হারিয়ে ফেললে তুমি।

বর্মা। নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ, নতুন আকাশ, নতুন বাতাস। আমিও নতুন। আর তুমি? আজ কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। তুমি হয়ত পুরানোই রয়ে গিয়েছিলে।

নতুন পরিবেশে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই হয়ত তোমার দিকে লক্ষ্য করার অবসর পাই নি।

সেই তিনটি বছর! বাঁধন-ছেঁড়া দিন-রাত্রির জোয়ার। অনাবিল আনন্দের স্রোত।

তুমি কথা বলতে কম। চিন্তা করতে বেশী। তাই তোমাকে বুঝতে পারিনি।

তাছাড়া ছিল সেই ঝরনার জল। ঝরনার ধারে অশোক-পলাশে ঘেরা ছোট্ট প্যাগোডা। তার ভেতর বুদ্ধমূর্তি। লোকালয় থেকে দূরে, গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়, ইতিহাসের এই গোপন কক্ষ। তারই ভেতর তথাগত। বড় সুন্দর, বড় শান্ত। সেই পাইন, বনঝাউ, দেওদার বনছায়া।

বন-ভোজনের দিনগুলি। ফরেস্ট অফিসার মিঃ ব্রাউন, তার স্ত্রী, আর তাদের ছোট্ট মেয়ে ডলি। সারকিট অফিসের বড়সাহেব, তাঁর মজলিসী সহধর্মিনী। প্রবাসী বাঙালী ক্যাপ্টেন প্রবীর চৌধুরী, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার।

আর সেই যে মেয়েটি আমাদের দুধ বিক্রী করত? উত্তর বর্মার ছোটখাট বেঁটে মেয়েটি। সমাজের নিচু স্তরের মানুষ। পরিশ্রম না করলে বাঁচতে পারত না তারা। মেয়েটিও কি ভীষণ খাটিয়ে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতাম, কোলের বাচ্চাটাকে পিঠে ঝুলিয়ে মাঠে-মাঠে গরু চরিয়ে, ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রোদ-ঝড়-জল মাথায় করে কখনও বা পাহাড়ের নিচে বসে-বসে ঘাস কাটছে। তার যে কত অভাব, তা তাকে দেখলেই বোঝা যেত। অথচ একটা দিনের জন্যেও তার মুখ থেকে নিজের দুঃখের একটা কথাও শুনতে পাইনি আমি।

যে মেয়েটি আমাদের কাছে মাংস বিক্রী করত, তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। স্বামী বৃদ্ধ। হাঁপানীতে ভুগছে কতকাল। কাজ করার ক্ষমতা নেই। বড় ছেলেটা যুদ্ধের বাজারে নিখোঁজ। আর দুটো জোয়ান ছেলেকে গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা বেগার ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বেদনা

খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বুকে পাথর চাপা দিয়ে মেরেছে। বুড়ী তিনদিন তিনরাত একটা জঙ্গলে লুকিয়েছিল। ইংরেজরা বর্মায় ফিরে এসে ওদের ঘর-বাড়ী সব আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবু দমেনি সে। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে ষাট বছরের বুড়ী নতুন করে সংসার পেতেছে। অতীতকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে। জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে শেখেনি। এই বৃদ্ধাকে মনে মনে অনেক শ্রদ্ধা জানিয়েছি আমি।

অনেক স্মৃতি-বিস্মৃতির চিত্রশালায় ঘেরা সেই তিনটি বছর আমার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে অমূল্য সঞ্চয়। সেদিন আরও একটু সজাগ থাকলে দেখতে পেতাম এই পৃথিবীকে। বুঝতে পারতাম মানুষের সভ্যতাকে।

বুঝিনি। কারণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম সেদিন। অনেক হাসি-কান্না, মান-অভিমান আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আগাছার মত ছেয়ে থাকত।

নদীর স্রোত আর জীবনের স্রোত। এ দুই এর ভেতর মিল নেই। নদীর স্রোত যায় আবার ফিরে আসে। জীবনের স্রোত যাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে আর ফেরে না। ফিরলেও ঠিক তেমনটি আর ফেরে না।

সেই জীবনের প্রবল স্রোতের ঘূর্ণিতেই তলিয়ে গেলাম আমরা।

অনেক দিনের মত সেবারও তুমি ব্যবসার খাতিরে জঙ্গলে গিয়েছিলে। আমাদের বাংলো থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে বর্মী পাহাড়ের শাল, পিয়াস, সেগুনের জঙ্গল। কাটাই শুরু হয়েছিল। সেই লগ বোঝাই হবে ওয়াগনে। যাবে পোর্টে। পোর্ট থেকে চালান যাবে বিদেশে। শীত থেকেই এই কাঠ-চেরাই শুরু হয়। ছোট্ট-বড়-মাঝারি নানান রকমের গাছ। কোনটাকে কাটতে হবে, কোনটাকে ছাঁটতে হবে। কারও খুঁড়তে হবে গোড়া, কোথাও জ্বালাতে হবে আগুন। অনেক লোক খাটে এই সময়। অনেক লোক যাতায়াত করে। কুলি থেকে কনট্রাক্টর।

এবারের মেয়াদ একটু বেশী। সাত দিনের জায়গায় একুশ দিন। তোমার পার্টনার বিশেষ কাজে কলকাতায় আসাতেই নাকি তোমার খাটুনি বেড়েছিল। আমাকে দেখাশোনা করার ভার দিয়ে গিয়েছিলে ক্যাপ্টেন প্রবীর চৌধুরীর ওপর। মিঠে-স্বভাব, স্বল্পভাষী প্রবীর চৌধুরী। তোমার বিশেষ বন্ধু।

একুশ দিনের মেয়াদ গড়িয়ে এক মাস। তারপর আরও পনের দিন। পনের দিনই তো? ক্যালেণ্ডারের সেই ২৩শে মাঘ আমাদের বিয়ের তারিখ।

আশা করেছিলাম, যেখানেই থাক ঐ দিনটি তুমি ভুলবে না। কিন্তু তুমি ভুললে। অন্তত তুমি এলে না। আমার চোখের ওপর দিয়ে ২৩শে মাঘ অনাদরে ফিরে গেল।

লাল কাঁকরের রাস্তার দিকে চেয়ে-চেয়ে ঝড়ো বাতাসের মতই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হল, আমি একা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব-হীন। বাবা-মার ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা অভিমানে ফেটে পড়েছিলাম। আমার ওপর সুবিচার করেননি তাঁরা। আমাদের সংসারে কোনদিনই মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না। ছিল স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থের কাছে, অলঙ্কারের কাছে, সচ্ছলতার কাছে, আর এদেরই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আলস্যের কাছে নিজেদের আহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা। স্বাধীন মানুষের জীবনে এতটা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য থাকার কথা নয়।

এই সাধারণ গণ্ডী থেকে আমিই কেবল সরে এসেছিলাম। বাবা-মা আমাকে অতটা স্বাধীনতা কেন দিয়েছিলেন জানিনে। কিন্তু একবার স্বাধীনতার স্বাদ বোঝার পর আর দাসত্বকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। পারব না কোনদিন—এই ছিল আমার দম্ভ। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় মুখ টিপে হেসেছিলেন। তা না হলে, এক জায়গায় শিকল কেটে আর এক জায়গায় ধরা দিলাম কেন? ব্যক্তিত্বই যদি না হারাব, তাহলে তোমার অভাবে নিজেকে অতটা অসহায় মনে করেছিলাম কেন?

সেদিন হঠাৎ এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল। বদ্ধ ঘরের বাতাসকেও বিদ্রোহী করে তুললো। আমাকেও কি তুলেছিল? হয়ত বা। ঝড় বড় সংক্রামক।

নিদারুণ নিঃসঙ্গতা! মাঝে-মাঝে উটকো হাওয়ার মত চিলের ডাক সেই দৈত্যদীঘল নিঃসঙ্গতাকে ব্যঙ্গ করে যেত। ধুলো-বালি-ঝড়, মেঠো পথ, আর দূর চক্রবালে মিলিয়ে-যাওয়া সূর্যাস্তের সমারোহ। এরাই ছিল আমার সঙ্গী।

হ্যাঁ, আর আসতেন তোমাদের প্রবীর চৌধুরী। নিয়মিত। ভদ্রলোকের দায়িত্বজ্ঞান অসীম। ধৈর্যের দৈর্ঘ্য বুঝি তার চেয়েও বড়। কথা বলতেন কম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি অন্তর্ভেদী। বড় জোরালো। রাজ্যের পত্রপত্রিকা সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। বসে-বসে গল্প করতেন। সঙ্গে করে বীচে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করতেন। কখনও বা ব্যালেতে।

আমার ওপর তাঁর সহানুভূতিটাই বুঝি প্রবল ছিল। আমার যেন মনে

হয়েছিল তাই। আর এই মনে হওয়াটাই তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। কেউ আমাকে অনুকম্পা করছে জানতে পারলে তাকে সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। প্রবীরবাবুর ভদ্রলোকী মনোভাব তাই আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে আকাশে ছেয়ে এল মেঘ। কাল কাল মেঘ। বঙ্গোপ-সাগরের বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলকণাগুলি বর্ষার আকাশ ছেয়ে দিল। বিপুল মেঘ-গর্জনের মধ্যে অগ্নিবর্ষী বিদ্যুতেরা সাপের মত কিলবিল করে উঠল।

পিয়ানোর কাছে চুপটি করে বসেছিলাম আকাশের দিকে চেয়ে। কখন যে পিয়ানোতে মাথা ঠেকিয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছি বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ পিঠের ওপর কার আলতো হাত পড়তেই চমকে উঠলাম। দেখলাম, প্রবীর চৌধুরী চুপটি করে পেছনে দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ল আমার।

প্রবীরবাবু বললেন: ত্রিলোকেশবাবুর ফিরতে এখনও দেরি আছে, মিসেস চৌধুরী।

—কি করে জানলেন?

কোন উত্তর দিলেন না প্রবীর চৌধুরী। একটু হাসলেন মাত্র। সেই হাসি বেদনার, না, ব্যঙ্গের—আজও ঠিক বুঝতে পারিনি।

সেদিন কিন্তু আরও উত্তেজিত হয়ে রুক্ষভাবে প্রশ্ন করেছিলাম: কি করে জানলেন আপনি? কি? চুপ করে রয়েছেন কেন? জবাব দিন।

প্রবীরবাবু হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠলাম: জবাব দিচ্ছেন না কেন?

অত্যন্ত শান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে প্রবীরবাবু বললেন: আপনি উত্তেজিত। তা না হলে বলতাম, সে কথা আপনার না জানাই ভাল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম: আপনাকে আমি চিনিনে মনে করেন? আপনি. .আপনি ......কিসের লোভে এখানে আসেন? স্কাউনড্রেল কোথাকার। যান. বেরিয়ে যান এখান থেকে।

চমকে উঠলেন প্রবীরবাবু। একটা তীব্র বেদনার ছাপ পড়ল তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন: যাচ্ছি, যাচ্ছি।

হঠাৎ একটা বজ্রপতনে চারপাশ ঝলসে গেল। বাইরে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। সেই দুর্যোগ মাথায় করে প্রবীরবাবু বেরিয়ে গেলেন। সামান্য একটু ভদ্রতা, একটু সৌজন্যবোধ, তাও হারালাম মুহূর্তের উন্মাদনায়।

সেদিন অনেক চেষ্টা করেও প্রবীরবাবুর আসল কথাটা বুঝতে পারিনি। পারলাম আরও মাসখানেক পরে।

ফিরে তুমি এসেছিলে ঠিকই। কিন্তু আগের-তুমি নও, পরের-তুমি।

সত্যি কথা বলতে কি, খুশী হয়ে অভ্যর্থনা করতে পারিনি তোমাকে। পুরো দুটি মাসের জমানো অশ্রুর ঢল নেমেছিল আমার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে। সেই উদ্গত অশ্রুর চাপকে সংযমের বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখতেই আমার সমস্ত শক্তি খরচ করতে হয়েছিল। আনন্দ করার শক্তি তখন পাব কোথায়?

দেরি করে ফেরার কৈফিয়ত তোমার কাছে চাইনি আমি। কিছুটা আশঙ্কা করলেও যখন তুমি দেখলে আমি যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলেছি, তখন তুমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

অথবা আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হল না বলেই বোধ হয় নিজের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার তাগিদে তুমি তোমার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেললে। ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করতে তুমি। কিন্তু আমি বেশ লক্ষ্য করতাম, তোমার সেই আগেকার অনায়াস পদক্ষেপ বারবার অস্বস্তির বাধায় হোঁচট খাচ্ছিল। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির দৈন্য। ঘুমোতে-ঘুমোতেও অনেক সময় চমকে উঠতে তুমি।

সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে আমাকে: প্রবীরবাবু তোমার দেখাশোনা করতেন তো?

বললাম: আমার দেখাশোনা আমি নিজেই করতে পারি। তার জন্যে প্রবীরবাবুর দরকার নেই।

তুমি বলেছিলে: তা কি হয়? এই বিদেশ-বিভুঁইএ একজন বন্ধুর দরকার সব সময় থাকে। তা ছাড়া, আমায় আবার বেরোতে হবে তো!

প্রশ্ন করলাম: কোথায়?

বললে: জঙ্গলে।

আর জঙ্গলে তোমার যাওয়া হবে না।

সে কি হয়? টমাস কোম্পানীর কাছে জঙ্গলটা বিক্রী করে দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম: সে কি? এ সব সংবাদ তো আমার জানা ছিল না।

তুমি একটু হেসে বলেছিলে: সব কথা নাই বা জানলে!

আমি চুপ করে গেলাম। তোমার মন্তব্য স্বীকার্য বলে নয়, অশ্রদ্ধেয় বলে।

একটু চুপ করে থেকে তুমি প্রশ্ন করেছিলে: প্রবীরবাবু আসছেন না কেন?

তাঁকে আমি আসতে বারণ করেছি।

তুমি একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে: কেন?

বলেছিলাম সেদিন: আমার খুশী।

তুমি আরও বিরক্ত হয়ে বলেছিলে: তোমার খুশীতেই কি জগৎ চলবে বলে মনে করেছ?

ঘাড় বাঁকিয়ে আমিও সেদিন জবাব দিয়েছিলাম: জগৎ না চলে সেটা তার ইচ্ছে। কিন্তু আমার চলা তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

আমার উত্তর শুনে তুমি চুপ করে গিয়েছিলে। কিন্তু সারা মুখ জুড়ে তোমার সেদিন ফুটে বেরিয়েছিল অবজ্ঞার হাসি।

আমার শেষ কথাটা তোমায় জানিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন: জঙ্গলে যাওয়া তোমার চলবে না।

হঠাৎ তোমার চোখে-মুখে একটা ক্লান্ত অপরিতৃপ্তির বেদনা চকচক করে উঠল। তোমার নিজস্ব ভাষায় তুমি বললে: মানুষ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, শীলা। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ব্যক্তিস্বাধীনতা। আমার সেই স্বাধীনতায় তুমি হাত দিতে যাচ্ছ।

নিজের কানকে সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি আমি।

দ্বিতীয় আর কোন কথা হয়নি তোমার সঙ্গে।

হঠাৎ আবার একদিন চলে গেলে তুমি। বেয়ারা এসে সংবাদটা জানিয়ে গেল আমাকে।

আবার একা। আগে তবু তোমার ফিরে-আসার আশা ছিল। এবার কেবল দীর্ঘ সর্পিল ভবিষ্যৎ। ফিরতেও পার। আবার ইচ্ছে হলে নাও পার।

একা। লাল কাঁকরের রাস্তা। মাঝে-মাঝে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া। বর্মী পাহাড়ের ওপর দূর বনানীর ক্লান্ত অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস। আর আমি।

সাতটি দিন। মনে হল সাতটি মাস যেন।

শেষকালে আর থাকতে না পেরে প্রবীর চৌধুরীরই শরণাপন্ন হতে হল।

প্রবীর চৌধুরী আমাকে একটু লক্ষ্য করলেন। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সেদিনের সেই অপমানের কোন চিহ্ন এখনও কোথাও রয়েছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছুই খুঁজে পেলাম না।

তিনি গাড়ী বার করে বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

তিনি যেন সবই জানেন। কেন এসেছি, কোথায় যাব, কিছুই অগোচরে নেই তাঁব।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম ভয়ে-ভয়ে: কোথায়?

গাড়ীতে স্টার্ট দিযে প্রবীরবাবু বললেন: যেখানে আপনি যেতে চান।

রেঙ্গুন শহরের চল্লিশ মাইল উত্তরে ছিল আমাদের বাংলো। তারও প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আমাদের জঙ্গল। আমাদেব মোটর তীব্রবেগে ছুটে চলল দক্ষিণের দিকে।

জিজ্ঞাসা করলাম: এদিকে কেন?

প্রবীরবাবু বললেন: ত্রিলোকেশবাবুর সঙ্গে দেখা কবতে হলে এই একটি পথ রয়েছে, মিসেস চৌধুরী।

চুপ করে রইলাম। দুপাশের গাছপালা ছাড়িয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমাদের মোটর। এর ভেতর প্রবীরবাবু একটি কথাও বলেননি। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সেখানে কোন ভাবান্তর নেই। একটি সুকঠিন লৌহবর্মে সমস্ত কিছু ঢেকে রেখেছেন।

বললাম, অর্থাৎ বলতে বাধ্য হলাম: আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে সত্যিই দুঃখিত।

প্রবীরবাবু বললেন: আপনি দুঃখিত কিনা তা নিয়ে ভাবছিনে। আমার সম্বন্ধে আপনার মনে যে নোংরা ধারণা জন্মেছে তাই দূর কবাব কিছুটা চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্তু এর সমস্ত দায় আর দায়িত্ব আপনার। আমার নয়।

একটি হোটেলের সামনে গাড়ী থামিযে বললেন: আমি অপেক্ষা করছি। আপনি দোতলায় উঠে যান।

দোতলায় একটি ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুলে গেল। ঘরে

ঢুকেই আঁতকে উঠলাম। তোমাকে দেখে নয়। তোমার সঙ্গিনীকে দেখে। দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিলে সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

ভূত দেখলে মানুষ যেমন করে আঁতকে ওঠে, তোমরাও সেদিন আমাকে দেখে তেমনিভাবে আঁতকে উঠেছিলে।

কিন্তু অদ্ভুত কৃতিত্ব তোমার। একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে তুমি একটু বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিলে : শেষ পর্যন্ত স্পাইগিরি শুরু করলে ? ছিঃ !

কোন উত্তর দিইনি আমি। হঠাৎ কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। টেবিলের ওপর তোমার রিভলভারটা পড়েছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। লক্ষ্যটা কার দিকে ছিল আজ ঠিক স্মরণ করতে পারছিনে।

হঠাৎ অনিতার চিৎকার কানে এল : আমাকে মেরে ফেল, লীনা, আমাকে। দোষ ওর নয়, আমার।

অনিতাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি। বললে : তার আগে আমাকে মার।

একবার চেয়ে দেখলাম তোমার দিকে। একবার অনিতার দিকে। কী-যে দেখলাম জানিনে। হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপরেই রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ঝড়ের মত বেগে বেরিয়ে এলাম।

প্রবীরবাবুকে বললাম : এক্ষুনি চলুন প্রবীরবাবু। এক্ষুনি।

গোটা শরীরটা আমার কাঁপছিল তখন। পাহাড় ফাটার আগে পৃথিবীটা যেমন করে কাঁপে। গোটা পথটা আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম। ফাঁকা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ভেবেছিলাম, বাঁচতে গেলে বোধ হয় আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই আমার।

বাড়ীতে ফিরে দেখলাম, আত্মহত্যার ভাপটা কখন বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছে। তার বদলে পাহাড়-ই ফাটলো। রাশিরাশ আগুন, আর গলানো পাথরের ছিটানি। তোমার-আমার অনেক ছবি ছিল। সব পুড়িয়ে ফেললাম। ড্রেসিং টেবিল ভাঙলাম। শার্সি ভাঙলাম। চাকরকে বকলাম। চীনা মেয়েটি দুধ দিতে এসে অনর্থক ধমক খেল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সকাল বেলা। তোমার চিঠি এল। অনেক কথা লিখেছিলে তুমি। তার মধ্যে দুটি কথা অতি স্পষ্ট। অনিতাকে ছাড়া তোমার চলবে না, আর প্রবীরবাবুকে আমি বিয়ে করলে তুমি খুশী হবে।

ঘৃণা এল তোমায় চিঠি পড়ে। গোটা পুরুষজাতের ওপর নেমে এল

বিরক্তি। প্রেম-ভালবাসার ওপর ধিক্কার। সেদিন মনে হয়েছিল, মানুষ আসলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের ইন্দ্রিয় পরি-তৃপ্তিই তার সকল কথার সেরা কথা, সকল চিন্তার সেরা চিন্তা। এই পঞ্চাশ হাজার বছরের ইতিহাস কেবল বঞ্চনার ইতিহাস। নর-নারীর মিলনের ব্যর্থতা, আর যৌবনের অভিশাপের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন মায়ের সেই তুফানে বন্দর ভেসে যাওয়ার কথাটাই বারবার মনে পড়তে লাগল।

হারাম্ব-মারু জাহাজের ডেকে বসে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলাম। কালো সমুদ্রের ক্রম-প্রক্ষিপ্ত তুফানের দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ মনে হল, জীবনটাও তো এই রকমই উত্তাল কলরোলে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে এগিয়ে চলেছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। এক অভিজ্ঞতা থেকে অন্য এক অভিজ্ঞতা। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। অনেকদিন পরে নিজেকে ভুলে মায়ের কথা মনে পড়ল। মাকে টেলিগ্রাম করলাম: যাচ্ছি।

ডেকের ওপর কত লোক। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু। সকাল থেকেই সোরগোল পড়ে যায়। কত রকমের আনন্দ, উচ্ছ্বাস, কত রকমের জল্পনা-কল্পনা। কেউ যাচ্ছে বিদেশে, কেউ ফিরছে দেশে। কারও মুখে অনিশ্চয়তার কৌতূহল, কেউ আবার নিশ্চয়তার আনন্দে মাতোয়ারা। এদের তবু একটা ঘাট ছিল। এদের ছিল তবু একটা দল। আমার ঘাটও ছিল না, দলও ছিল না। তবু এদের দেখেই আনন্দ হচ্ছিল। পৃথিবীটা যে বৈচিত্র্যে ভরা—এই কথাটা সেদিনই যেন মন দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম আমি।

হয়ত এর জন্যে সমুদ্রই দায়ী। বৃহতের আবেদন এইখানেই। বৃহতের মুখোমুখী এলে কোন ক্ষুদ্রতাই মনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে না। তাই বোধ হয় সমুদ্রকে সমুদ্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখার সুযোগ সেদিনই আমার জীবনে প্রথম এসে হাজির হয়েছিল। আমার একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনের ওপর এই মহাশূন্য তা[illegible] বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। আমার জীবনের সংকীর্ণতা, আর একান্ত ব্যক্তিগত হাহাকার সেই তরঙ্গের মত ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। সেদিন[illegible] যেন প্রথম আবিষ্কার করলাম, কোন মানুষের ওপর নির্ভর করে জীবন বাঁচে না। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে চাওয়াই মানুষের বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। ঠিক সেই সময় মনে হল, আনন্দ করার অধিকার মানুষের যেমন নেই, তেমা[illegible] নেই শোক করার বিলাস। সমুদ্রের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে না পারে[illegible] পদে-পদে অপমৃত্যুর বন্ধুর পথে হোঁচট খেতে হবে।

কলকাতার বন্দরে এসে দাঁড়ালাম। সেই পুরানো কলকাতা। আমার-কৈশোর-যৌবনের কলকাতা। বড় ভাল লাগল। মনে হল, যেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুর কাছে ফিরে এসেছি আবার। জেটিতে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে গঙ্গার শোভা দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কানে একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল : দিদিমণি !

ঘুরে চেয়ে দেখি আমাদের বাড়ীর চাকর ভজহরি। এক মুখ হেসে আমাকে দেখছে।

বললাম : ভজুদা, ভাল আছে ? বাবা-মা-দাদারা ?

ভজহরি ছোট্ট একটি ঢোক গিলে বলল : বাবু নেই।

বাবা নেই ! এক বছর আগেই মারা গিয়েছেন।

ফিরে এলাম বাড়ীতে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদলাম। এতদিন কাঁদতে পারিনি বলেই হয়ত তোমার ওপর আমার মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। আজ মেঘমুক্ত আকাশের মতই আমার মন তোমার ওপর অনুকম্পায় ভরে উঠল। অনিতার ওপর মায়া হল। যে মানুষ প্রিয়-বিচ্ছেদ এত নিঃশব্দে সহ্য করেছে, একটিও কথা বলেনি, তার কাছে আমার দস্যুতা কত ছোট হয়ে দেখা দিল। অনিতা যে কিসের তাগিদে অতদূরে ছুটে গিয়েছে তা যেন আজ বুঝতে পারলাম।

মনুষ্যত্বের আদালতে আমিই আজ আসামী। তাই বর্তমান-তুমির ওপর থেকে সমস্ত মিথ্যা অধিকার তুলে নিলাম আমি। তবু একদিন তোমাকে পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তাকেও একেবারে ফাঁকি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। আমার অভিজ্ঞতার সে-ও একটি অমূল্য সঞ্চয়।

আবার নতুন মানুষ। নতুন পৃথিবী।

কেবল এই কথাটিই তোমাকে জানিয়ে দিলাম। আর কিছু নয়।

পিসীমা

বাস থেকে নেমেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। ঠিক গেল বলা চলে না—মেজাজটা সমস্ত দিনই প্রায় খিঁচড়ে ছিল। আজ মাসের পয়লা—আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু পয়লা তারিখ এলেই আমি কেমন যেন ভয়ে আধমরা হয়ে যাই। আজ চোদ্দ বছর চাকরি করছি। যা-তা অফিসে নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের দস্তুরমত একটি বেনেদী অফিসে। তবু, পয়লা তারিখে মাইনে যা পাওয়ার কথা, তার চার ভাগের এক ভাগও পকেটে আসে না। বাকিটা সব গিয়ে ঢোকে কোঅপারেটিভের অজগর-চোয়ালে। হাওয়া ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না, আমাদের মত কেরাণীর দলও তেমনি এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে হাওলাত না করলে বাঁচে না। আর দেনা বলে দেনা! একেবারে আকণ্ঠ। কিন্তু টাকা ধার করলে তা যে শোধ দিতে হয়, অন্তত আমাদের মত লোকদের, এ তো না-জানার কথা নয়; এবং একবার যখন খাতায় নাম লিখিয়েছি তখন সর্বতোভাবে নির্বিকারচিত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাকে এড়ানো যাবে না, তার জন্যে দুঃখ না করাটাই বিধেয়।

কথাটি নির্ভেজাল সত্য; কিন্তু তাই বলে প্রিয় নয়। কারণ, তাবৎ সংসারের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, পয়লা তারিখের জন্যে তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে থাকে—এবং আমাদের সঙ্গে পাওনাদারেরাও। মাসকাবারে তাদের কিছু দিতে না পারলে বিপদ নিজেদেরই। কিন্তু বর্তমানে পকেটে যা রয়েছে, তা দিয়ে আপাতত কোন্ মহাজনের মুখ আটকাব তা ভাবতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অথচ, আত্মীয়স্বজনের প্রত্যাশার আর সীমা নেই। তারা জানে, ধার না থাক, ভারটি আমার ষোল আনার ওপর বাড়তি এক আনা।

গোদের ওপর আবার বিষফোঁড়া। গত মাসে আমার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়েছে। ঐ পুত্র ভবিষ্যতে আমার ঘর আলো করবে কি না জানি না, তবে বর্তমানে আমার চোখে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সেটি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। তার ওপর আবার বড় ছেলেটির পরীক্ষার খরচ। এককোঁটা ছেলে

—পড়ে ক্লাস ফোর-এ। বাপরে বাপ; তার বায়নাক্কায় প্রাণ কণ্ঠে এসে ঠেকেছে। পয়লা তারিখের বিশেষত্ব' কোথায় সেও-বেশ বুঝে নিয়েছে। আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা কত অল্প বয়সেই যে পেকে যায়, তা ভাবলেও দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করে।

সবেমাত্র বাস থেকে নেমে দ্রুত পদে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি, আবার ছেলে চরাতে যেতে হবে, এবং একটি নয়, তিনটি; ছেলে তো নয়, পিলে—এমন সময় বাবলু আমাকে রাস্তার মাঝখানেই জড়িয়ে ধরল। অন্যমনস্ক ছিলাম বলেই বোধ হয় প্রথমে ওকে দেখতে পাই নি। হোঁচট খেতে যাব এমন সময় বাবলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বাপি, বাপি—দাদুম এসেছেন!

ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ বিষম খেয়ে উঠলাম।

কোন্ দাদুম রে?

বাবলু আমার একটা হাত ধরে নাচতে নাচতে বলতে লাগল—ঐ যে গো ন-দাদুম।

চোখ বড়-বড় করে বললাম—বলিস কী রে!

সে বলল—হ্যাঁ। এই অ্যাত্তো জিনিস এনেছেন। বাতাসা, গাবি, মুড়কি···

আমি কিন্তু মনে-মনে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেলাম। বাবলুর ন-দাদুম আমার এক দূর সম্পর্কের ন-পিসীমা। বাবার মামার মেয়ে। বয়স সত্তর পেরিয়েছে। বালবিধবা। কবে সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সেকথা আমাদের জানা নেই, তাঁরও মনে আছে কিনা সন্দেহ। বিধবা হওয়ার পর দিনকতক শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। তারপর বাপের বাড়িতে বছরখানেক। পিতৃমাতৃহীন সংসারে নেহাত আবর্জনার মতই পড়েছিলেন তিনি। তারপর কবে আর কী করে যে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন, তা আমরা জানিনে। তবে শুনেছি, সেটাও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সেই থেকে আমাদের দেশের বাড়িতেই তিনি রয়ে গিয়েছেন।

একে বালবিধবা, তার ওপর পঞ্চাশ বছর আগেকার পল্লীগ্রাম। অনুমান করতে পারেন পিসীমার অবস্থাটা। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর ব্যবহার বোধ হয় এই সমস্ত নিঃসহায় অত্যাচার জর্জরিত মানুষকে লক্ষ্য করেই করা হয়। আর তারই ফলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ব্যাপারটা যাই হোক, ভীষণ রগচটা মানুষ ছিলেন এই ন-পিসীমা। আর একটু কোন্দল-প্রকৃতির। সকলের সব বিষয়েই তাঁর নাকগলানো চাই। প্রভুত্ব করার অনাবশ্যক স্পৃহা তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল।

চল্লিশের পর থেকে পিসীমা একটি রীতিমত অসামাজিক জীবে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, সমাজের ধারক আর বাহক হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনগুলি যাতে কেউ অবহেলা করতে না পাবে সেদিকে তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। এক কথায় ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারের একটি নিবিড় ডিপো ছিলেন এই পিসীমা। আর এই নিয়ে আমার মা-কাকীমা-জেঠিমাদের যে কত অকারণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হ'ত, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু সবই তাঁদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। একে বালবিধবা, তায় আবার ননদ। বাবার স্নেহচ্ছায়ার আড়ালে থাকার ফলে আমরা কেউ পিসীমার মুখের ওপর জোরে একটা কথা বলতে সাহস করতাম না।

বিগত চল্লিশটি বছরের মধ্যে নলবেড়ের চৌধুরী-পরিবারে অনেকের জন্ম হয়েছে, অনেকের বিয়ে হয়েছে, আর সেই সঙ্গে মৃত্যুও কম হয় নি। এসবের সন-তারিখ-ঘণ্টা পিসীমার সব মুখস্থ। অধুনা বিশ বৎসর যাবৎ ঐ পিসীমাই একটি জীবন্ত পঞ্জিকার কাজ করে আসছেন। যে-কোন বিষয়ে, যে-কোন কথা উঠলেই হল, পিসীমা আঙুলের গাঁট গুনতে বসেন। আপনারা যদি মনে করেন সব সময়ে পিসীমার তথ্য বিশ্লেষণ নির্ভুল, তা হলে কিন্তু ভুল করবেন। অর্থাৎ তথ্যের জন্যে কোন বালাই নেই তাঁর। তবে হ্যাঁ, যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে আপনাকে। না নিলে, আপনাকে তিনি ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন।

সব বিষয়েই তাঁর একটি নিজস্ব মতামত রয়েছে—আপনি তা মানুন, আর ছাই না মানুন। শোনা যায়, মাংসাশী জীবমাত্রেরই রজোগুণ একটু বেশীমাত্রায় থাকে, এবং পিসীমা যেহেতু হিন্দুঘরের বালবিধবা সেই হেতু সকলেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি কিছুটা অন্তত শান্তগুণের অধিকারিণী হবেন। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাঁরা সবাই তাঁকে উন্মত্ত রাজীব সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং মহাজন-বাক্য অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সকাল থেকেই তাঁর গলাবাজি সুরু হয়। সংসার, সমাজ, ভগবান, মায় মৃত পিসেমশাই পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থাকেন : কখন কার কানে মোচড় দিয়ে বসবেন কে জানে। পিসীমা না ঘুমোলে কারও নিস্তার নেই। তা ঘুমই কি ছাই তাঁর চোখে রয়েছে। আমি এই দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে কখনও তাঁকে বেঘোরে ঘুমোতে দেখি নি। 'হোয়াইট ম্যানস

বার্ডেন'-এর মত বিশ্ব-সংসারকে নাস্তানাবুদ করার গুরু দায়িত্ব যাঁর ঘাড়ে তার ঘুমোবার মত অপর্যাপ্ত সময় কোথায় ?

আমাদের বংশটি বিরাট। অনেক কাকা-জ্যেঠা ; ভাই-বোনও অগুনতি। নজরটি কিন্তু আমার ওপরেই তাঁর একটু যেন বেশী ছিল। আমার ওপর কারও অধিকার বরদাস্ত করার মানুষ তিনি ছিলেন না। আমাদের গাঁয়ের স্কুলে পড়ুয়া-ছেলে ব'লে আমার কিছুটা নাম ছিল। কিন্তু ন-পিসীমা ভাবতেন, আমি বিদ্যাসাগরকেও ঘায়েল করে দিয়েছি। প্রতিটি পরীক্ষার ফল বেরোবার পর পিসীমা একবার গাঁবের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে সকলকে শুনিয়ে দিয়ে আসতেন যে, আমার মত হীরের টুকরো 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। একবার ক্লাশে সেকেণ্ড হওয়ার পর আমাদের হেডমাস্টারমশাইকে রাস্তায় ধরে এমন লেকচার দিলেন যে, তিনি পালাবার পথ পান নি।

বাড়িতে এসে বাবাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—মার ঝাড়ু, মার ঝাড়ু। পেলা দেসো (হেডমাস্টারমশাই-এর নাম শ্রীপ্রহ্লাদ দাস) আবার ম্যাস্টর ! হুঁ !

বি. এ. পাস করার পরেই পিসীমার হুকুম জারি হয়ে গেল—নারানের বে দে, অবিনাশ।

নলবেড়ের চৌধুরীরা বনেদী মানুষ। লেখাপড়া করা যেমন তাদের ধাতে সহ্য হ'ত না, তেমনি অসহ্য লাগত চাকরি করার কথা চিন্তা করা। বহুপ্রভুভুক্তা বারবনিতার মত বহুশরিকে বিভক্ত চৌধুরী বংশ একটি দুঃস্থ গ্রাম্য জাদুঘরে পরিণত হয়েছিল। সেই বংশের ছেলে আমি। আমার মাথায় দায়িত্ব অনেক। আমার এখন বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠে না।

বললাম—খাওয়াব কী পিসীমা ?

ধমক দিয়ে ন-পিসীমা বললেন—ওঃ, কী আমার এলেমদার এয়েছেন রে ! তুই খাওয়াবার কে র‍্যা ? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। মানুষ নিজের ভাগ্যে খায়, বুয়েছিস ?

পিসীমার মত তীক্ষ্ণ মগজ আমার কোনদিনই ছিল না। তখন যা বুঝতে পারি নি—আজও তা আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য। তাই বোধ হয় মনে হচ্ছে, জীব যিনি দিয়েছেন, আহার যোগান দেওয়ার জন্যে তিনি দায়ী নন। আজকাল খাবার দেওয়ার লঘু দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা 'ফ্যামিলী প্ল্যানিং' নিয়ে মেতেছেন, এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের শক্তি

অসীম; দেবতাদের কান ধরে ওঠ-বোস করাতে পারেন প্রয়োজন হলে। পিসীমা সেকেলে মানুষ। আধুনিক দেবতাদের এই সব ক্রিয়াকলাপ তাঁর বোঝার কথা নয়। তাই আমাকে আজ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মরতে হচ্ছে; এবং এই পরিশ্রম করেও যা পাচ্ছি, তাতে দু'বেলা দু'মুঠো মোটা ভাতের সংস্থান করা ছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবতে গেলেই ব্লাড-প্রেসার বেড়ে টইটম্বুর হয়ে যায়। দৈনিক বরাদ্দের একটু এদিক ওদিক হলেই ব্যস—একেবারে পপাত ধরণীতলে।

ন-পিসীমার ধারণা, আমি একটা কেষ্টবিষ্টু মানুষ। কলকাতায় বাসা নিয়ে থাকি; অতএব আমার রোজগার অনেক। বেটাছেলের রোজগারের উপায় যে কত রকম সে সম্বন্ধে পিসীমার কয়েকটি উদ্ভট ধারণা রয়েছে। আমি কত মাইনে পাই, তা শুনে চোখ কপালে তুলে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন —আর ঘুষ?

বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম—ঘুষ কি পিসীমা?

পিসীমা আমাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন—বাজে কথা বলিস নি, নাদান। ওদের ন্যাড়া একটার বেশী দু'টো পাস করে নি। মাসে তিনশ টাকা ঘুষ পায়। আর তুই কিনে এতগুলো পাশ করে ঘুষ পাস নে?

অকাট্য যুক্তি। লেখাপড়া শিখে ঘুষ না পাওয়াটা অপরাধ না হোক, অযোগ্যতা তো বটেই। তাই, আমি যে ঘুষ পাই নে, পিসীমা যেমন বিশ্বাস করেন না, আমার অবস্থা যে 'অন্ত ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণ' সেটিও তাঁর কাছে সমানভাবে অবিশ্বাস্য। একেবারে নিক্তির ওজনে মাপা—এতটুকু এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। তাই তিনি মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসেন, এবং বেশ কিছুদিন থেকে যান। এই কিছুদিনই আমার অবস্থা 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা'র মত। যাকে বলে, একেবারে আগুনে খোলায় কই মাছের বেহদ্দ।

পিসীমা বিধবা মানুষ। তিনি কিছু অন্নধ্বংস করেন বলে নয়। আমার জীবনান্ত হওয়ার অন্য কারণ রয়েছে।

প্রথমেই তিনি আমার বিশিষ্ট সাংসারিক নীতিটিকে নাকচ করে দেবেন। কাপড় কতখানি, তাই মেপে কোটকাটার কথাটা চিন্তা করা মহাজনবাক্য। কোট কেটে কাপড়ের জন্যে দৌড়াদৌড়ি করাটা বিপজ্জনক। পিসীমার 'এথিক্স' মেনে চলতে গেলে আপনাকে সেই নিরতিশয় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।

হাজার বায়নাক্কা তাঁর। ছেলের শরীর খারাপ হচ্ছে; গোয়ালাটা পাজির পা-ঝাড়া; এক পোয়া দুধে আধ সের জল ঢেলে তিন পোয়া করে ঠকিয়ে যাচ্ছে (দুধের বদলে যে আজকাল জলে খড়ি মেশানো হচ্ছে—এই তথ্যটি পিসীমার জানা নেই বলেই বাঁচোয়া); ছেলের সিল্কের ভাল জামা নেই, পাম্ সু নেই (পাম সু-র চেয়ে আজকাল লোফারস্ সু যে বেশি ফ্যাশনেবল তা পিসীমার অজানা); এক টুকরো মাছ খেয়ে নাকি কারও শরীর টেকে! (কলকাতার মাছ যে আজকাল সোনা দিয়ে মোড়া তা কি তিনি জানেন?); খেটে-খেটে নির্মলা (মদীয় সহধর্মিণী) একেবারে প্যাকাটি হয়ে যাচ্ছে (কথাটি সর্বৈব মিথ্যা।) —এইসব হাজার সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পিসীমা আমার ঘাড়ে সিন্ধু-বাদের দৈত্যের মত ঐ ক-টি দিন চেপে থাকেন। নির্মলা মুচকি মুচকি হাসে; আর বাবলুটা আমার কাছে সত্যিকারের বাবুল থর্নে রূপান্তরিত হয়।

পিসীমা ছিলেন সেকালের রাজচক্রবর্তীদের মত। যেখানে যাবেন, একেবারে হাট বসিয়ে দেবেন। ঘুট ঘুট করে লোক আসছে তো আসছেই। এখানে আসার সময় পিসীমা নিশ্চয়ই তাঁর পরবর্তী অবস্থান-সূচি গাঁয়ে বিলিয়ে আসেন। সকলকে কলকাতায় আসার জন্যে ঢালোয়া নিমন্ত্রণ জানান। হাজার হোক আমি যে কেউকেটা নই, তা-তো সকলের কাছে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। একে পিসীমার নিমন্ত্রণ, তার ওপর কলকাতায় আমার একটি বাসা রয়েছে। আদর আপ্যায়নের এতটুকু ত্রুটি হলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না। অথচ আমার আর্থিক অবস্থা যা.. ...

যাওয়ার সময়ও কি বায়নাক্কা কম? নতুন না পার, পুরানো কাপড় দাও, জামা দাও। গাঁয়ের লোকের অভাবের শেষ নেই। কলকাতায় এসেছেন এলেমদার ভাইপোর বাসায়। থলে ভর্তি করে জিনিসপত্র না নিয়ে গেলে সেখানকার মানুষেই বা বলবে কী? ইজ্জত থাকবে কোথায়?

অথচ পিসীমার নিজস্ব কিছু রেস্ত যে রয়েছে তা আমরা সবই জানতাম। সেটি যে কত তা আমাদের জানার উপায় ছিল না। এসব বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী পিসীমা—আর হ্যাঁ, কৃপণ তো বটেই। টাকার কথা জিগ্যেস করলেই গালাগালি করতেন। কিন্তু তবু কেউ ওঁর ওপর চটতে সাহস পেত না। কোন ওয়ারিসান ছিল না বলেই, সবাই নিজেকে ওঁর ওয়ারিসান বলে মনে করত। করত, কিন্তু সকলেরই বোধ হয় দুর্ভাবনাটা ছিল আমার দিক থেকে। সবাই ভাবত, হয়তো পিসীমার গুপ্তধন শেষপর্যন্ত আমিই লোপাট করে দেব। আর অন্যের কথাই

বা বলি কেন ? আমার নিজেরও কি এ সম্বন্ধে সন্দেহ কিছু ছিল না ? সুতরাং পিসীমার জন্যে আমার যেটুকু বাড়তি খরচ হচ্ছে, সেটিকে খরচ না বলে, ইনভেস্টমেন্টই বলা উচিত—অন্তত, বুদ্ধিমান লোকে তাই বলবে। কিন্তু বর্তমানকে নিয়েই আমি এত ব্যস্ত যে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

ঘরে ঢুকতেই নির্মলার সঙ্গে চোখাচোখি। সে মুচকি মুচকি হাসছে। এই মুচকি হাসিটি ওর রোগ, না স্বাস্থ্যের লক্ষণ তা আজও বুঝতে পারি নি আমি।

সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—ন-পিসিমা এসেছেন নাকি ? কোথায় ?

নির্মলা হেসে বলল—হ্যাঁ। আহ্নিক করছেন।

বাব্বা ! খুব বাঁচোয়া। আপাতত তো কাটি। পরে দেখা হলে বোঝা যাবে তখন।

নির্মলার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললাম—এক গ্লাস জল দাও দেখি তাড়াতাড়ি।

নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বলল—সে কি ? জলটল খাও। পিসীমা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নন।

বললাম—তারও বাড়া। তবে, খেতে যদি দিতে হয় তো তাড়াতাড়ি দাও। কাল আবার পড়াতে যাই নি।

ও-ঘর থেকে পিসীমার গলা শোনা গেল : কে রে ? নারান ? ইদিকে আয়।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। আমারও হয়েছে সেই দশা। করুণভাবে নির্মলার দিকে চেয়ে রইলাম—অর্থাৎ বোঝ একবার ব্যাপারটা। ইদিকে আয় মানেই এখন এক ঘণ্টা। আর এক ঘণ্টা মানেই বর্তমান ক্ষেত্রে চব্বিশটি ঘণ্টার ধাক্কা। টুইশনিতে আজ যাওয়ার দফা রফা।

বললাম—একটু জরুরী কাজ রয়েছে পিসীমা। ঘুরে আসি।

পিসীমা তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন এবং এটি তাঁর অভ্যাসের বাইরে—তাই আয়। আমি তো এখন রইলাম।

কথার ধারাটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে নির্মলার দিকে চোখ ফেরাতেই সে বলল—পিসীমার ইচ্ছে তাই। এখন কিছুদিন থাকবেন।

শুনেছি, করোনারি থ্রম্বসিসে মানুষ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে নিদারুণ একটি যন্ত্রণা অনুভব করে। আমারও ব্রেন-নার্ভে একটি অস্বস্তি অনুভব করলাম। চিরটা-

কালই অপরের হ্যাপা পোয়াতে-পোয়াতে জান কয়লা হয়ে গেল। রাত্রে বাড়ি ফিরতে ফিরতে এই কথাটাই ভাবছিলাম। পিসীমাকে কলকাতায় বেশিদিন থাকতে দেওয়াটা বিপজ্জনক। মান-লজ্জা-ভয়, তিন থাকতে নয়। জীবনপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল। এ সংসারে তাবৎ ভদ্রলোকের স্থান সঙ্কুচিত। নিছক বেঁচে থাকার এই কদর্য প্রতিযোগিতায় মনটাকে আগাগোড়া স্টীল ক্যাপসুলে মুড়ে রাখতে হবে। কোথাও এতটুকু ছিদ্র থাকলে চলবে না। থাকলেই কালনাগিনী সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে আমাকে দংশন করে যাবে। কিন্তু লখীন্দরের ভাগ্য ছিল ভাল। বেহুলার মত স্ত্রী ছিল তার। আমাদের কপালে ছোবলটিই অটুট রয়েছে, বাকিটা শূন্য। বর্তমান যুগে শ্রদ্ধা-ভক্তি-দয়া-মায়া, আতিথেয়তা আর কৃতজ্ঞতা মানুষের অগ্রগতির মাথায় গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দিয়েছে। অতএব, সব বরবাদ কর। নতুবা বিপদ হবে।

বাড়িতে ফিরতেই পিসীমা বললেন—হ্যাঁ রা নারান, তোর আক্কেলকে বলিহারি! আজকাল বুঝি পাশাটাশা খেলিস?

একটু হাসলাম। পাশা! তা মানুষের জীবনই তো একটি পাশা খেলা।

কিন্তু খেতে বসেই তাজ্জব বনে গেলাম। ভাল খাবার দেখলে যে মানুষের মাথা বিগড়ে যায় তা জানতাম না। কিন্তু আমার তাই হওয়ার উপক্রম হ'ল। চার রকম তরকারি, মাছের কালিয়া, নির্মলারও মতিভ্রম হ'ল নাকি? আশ্চর্য নয়। পিসীমার কাছাকাছি থাকলে মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম ঘটার কথা—নির্মলা তো নস্যি। তা না হলে ব্যাপারটি কি করেছে দেখুন? পয়লা তারিখ থেকেই ও যদি এই রকম উৎসব চালিয়ে যায় তা হলে? আগামী পয়লা তারিখ তো দিল্লী থেকেও দূরে।

পরের দিন সকালে বাজারে যাওয়ার সময়ে পিসীমা বললেন—আজ একটু ভাল মাছটাছ আনিস, নারান। নলবেড়ে থেকে ক'জনের আসার কথা রয়েছে কিনা।

পিসীমার খানদানি ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। ইচ্ছে হল আচ্ছাসে একবার শুনিয়ে দিই। আজকালকার দিনে একজন নয়, দু'জন নয়—ক'জনের জন্যে মাছটাছের ব্যবস্থা করা যে কী মেহনতের কাজ তা বোঝাই কাকে? নির্মলার ওপরেও রাগ হ'ল যথেষ্ট। সে-ও তো পিসীমাকে আমার অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারত। নিজের অক্ষমতার কথা নিজের মুখে কাউকে বলতেও তো মানুষের লজ্জা করে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে আসবে পিসীমা ?

পিসীমা বললেন—কেন, আমার চিঠি পাস নি ? সব খুলে তোকে চিঠি লিখে দিতে বললুম যে গনশাকে। গুয়োটা যা হয়েছে না নাবান তোকে আর বলব কী ?

গনশা হচ্ছে আমার জাঠতুতো ভাই। বারকতক স্কুল ফাইনালে 'রানার্স আপ' হয়ে আপাতত দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। একেবারে 'ফ্রি লান্সার'। আজকাল সে বক্তৃতা দেয়, পঞ্চায়েতি করে, রিলিফের চাল-ডাল মাথায় করে নিয়ে বেড়ায়, কারও বাড়িতে মড়া-পোড়াবার দরকার হলে লোক যোগাড় করে আনে—যাকে বলে 'স্যোসাল ওয়ার্ক'। এই অবস্থায় সে যে আজকাল গাঁজা-ভাঙ খাচ্ছে না, তা-ও হলফ করে বলতে পারি না।

হ্যাঁ, দিন সাতেক আগে তার একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি বটে। কিন্তু পড়ি নি। বিশেষ করে গনশার ওপর আমি কেমন একটু বেশি আস্থাহীন। ছেলেটা না শিখল লেখাপড়া, আর না করল রোজগার। গনশা আর রেসপন্সিবিলিটি—দুটি শব্দের গতি আর প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীতধর্মী। কেবল কথা—কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দেবে। ধমকানি খাওয়ার ভয়ে এ-বাড়িতে সে আমাকে অধুনা এড়িয়েই চলত। তার ফ্যানটাসটিক পরিকল্পনার একমাত্র নীরব শ্রোতা হচ্ছে নির্মলা, আর উৎসাহদাতা বাবলু।

পিসীমা আবার বললেন—গুয়োটা নাছোড়বান্দা, নাবান নলবেড়েতে একটা হাসপাতাল খুলে দিতে হবে। আর তারই বা দোষ দেব কি ? গত বছর কলেরায় যে কত মরল তা গনবে কে ? মায়ের দয়া হলে তো কথাই নেই। এমনি করে চোখের সামনে প্যাট-প্যাট করে যদি লোকগুলো মরেই যায়, তা'হলে আর নলবেড়েতে থাকবে কে বল ?

পিসীমার কথা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। হাসপাতাল তো চাই, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে শুনি ? এ কি দু-চারটে টাকার কম্ম ?

জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর ?

পিসীমা বললেন—গুয়োটা কম ধড়িবাজ। কেমন করে খবর পেয়েছে তোর পিসের কিছু কোম্পানীর কাগজ রয়েছে। বলে—তাই দাও। বাকিটা আমরা যোগাড় করে নেব। আমি বললুম—তা'লে চল নাবানের কাছে। লেখাপড়া জানা সৎ ছেলে—ব্যবস্থা একটা করেই দেবে। দ্যাখ দিকি কত রয়েছে ?

এই বলে কাগজের একটি পুঁটলি ও-ঘর থেকে বার করে আমার সামনে ধরে দিলেন

পোটলা খুলে সব দেখলাম। দেখেই চক্ষু চড়কগাছে উঠল আমার—প্রায় হাজার ছয়েক হবে। এগুলিকে এতদিন ইনি যক্ষের মত আগলে রেখে-ছিলেন এবং যেগুলি হাতাবার জন্যে আমার অবচেতন মনেও খানিকটা হ্যাংলামি লুকিয়ে ছিল।

একটু ভেবে বললাম—কিন্তু তোমাকে এই শেষ বয়সে দেখবে কে পিসীমা?

পিসীমা চোখ দু'টো বড় বড় করে বললেন—তুই থাকতে আমার ভাবনা কী রে নাবান?

যে কথাটি উচ্চারণ করতে আমার নিজের কষ্ট হচ্ছিল, সেই কথাটি পিসীমা এতটুকু দ্বিধা বা লজ্জা না করেই বলে গেলেন।

লজ্জায় পিসীমার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারলাম না কিছুক্ষণ।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়লাম। বললাম—এগুলো এখন রাখ পিসীমা, বাজারটা সেরে আসি।

রাস্তায় যেতে যেতে ভাবলাম—এ মাসে না হয় দু'-দশ টাকা দেনাই বেশি হবে। তবু, আজ যাঁরা আসছেন, তাদের কাছে পিসীমাকে কিছুতেই এতটুকু হেয় করা চলবে না।

প্রত্নতাত্ত্বিক

অসময়ে হঠাৎ-আসা বৃষ্টি। এবং তার সঙ্গে বেগমান ঝড়। এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত। ড্যালহৌসীর একটা কোণে কোন রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, পাশেই একটা জ্বলজ্বলে সাইনবোর্ড, "ব্যাচারামের নিউকেবিন।" লক্ষ্য পড়তেই ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি। একদিন যেন নামটার সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

বিস্মৃতির ঘোলা জল হাতড়াতে লাগলাম। মনে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে সুরু হয়েছে। চাকরি করতাম একটা অর্ডার সাপ্লাইং ফার্মে। তখন আমার সম্বল ছিল ঐ ব্যাচারামের নিউ-কেবিন। ছোট্ট একখানা ঘর। কোণগুলো সব ঝুলে বোঝাই। দিনের বেলাতেও দুটো একশ পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলত। মেঝের ওপর পাতা থাকত খানকত খোঁড়া বেঞ্চ। ফুটপাতের ধার ঘেঁসে একটা উঁচু বেদীর ওপর ব্যাচারাম তার নেয়াপাতি ভুঁড়ির নিচে গামোছা জড়িয়ে কচুরি ভাজত। তার লোমশ পুরুষ্ট দেহের কত ঘামই না ঐ তেলের ভেতর পড়ে কচুরির সঙ্গে আমাদের পেটে গিয়েছে।

তা যাক। তবু অত সস্তায় খাবার দেনেওয়ালা সে-যুগে ও-অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। কেবল কি সস্তা? ধার। অবশ্য দেওয়ালের ওপর 'আজ নগদ, কাল ধার' ইত্যাদি মহাজন-বাক্যগুলি ফ্রেমে আঁটা হয়ে ঝোলান থাকত। কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই। আমি কোনদিন নগদ খেয়েছি বলে তো স্মরণ করতে পারলাম না।

উঁকি দিয়ে দেখলাম। কিন্তু ঐ এক সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছুই প্রায় পুরানো আমলের নেই। নিয়ন দিয়ে সাজান ঘর। দেওয়ালে খড়িমাটির পলেস্তারা। ঘরের ভেতর ছোট ছোট কেবিন। কেবিনের দরজায় সৌখীন পর্দা। আর রাস্তার পাশে কাউন্টারে বসে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে আমাদের সেই বেচারাম। চিনতে এতটুকু কষ্ট হ'ল না।

সটান ভেতরে ঢুকে গেলাম। আর কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সোজা ব্যাচারামের সামনে গিয়ে বললাম, কি ব্যাচারাম, ভাল আছ ?

চারপাশের কর্মব্যস্ততার মাঝখানে প্রশ্নটা আমার নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাল। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বললাম সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আরে-রে, কি কাণ্ড ! বোসবাবু যে ! চিনতেই পারি নি। কি জ্বালা ! ওরে, চেয়ার দে। চেয়ার দে। বসেন। তারপর ? য্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন ?

সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে বললাম : সে অনেক কথা। আজ আট বছর এ তল্লাটেই ছিলাম না। দিনকতক হল ফিরেছি।

ব্যাচারাম বলে : তাই বলেন। আমি ভাবি বোসবাবু বুঝি কপ্পূরের মত উবে গেলেন। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ আপনার হদিস দিতে পারে নি।

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে হুঙ্কার ছাড়ল : এই হতভাগারা, দাঁড়িয়ে কেন ? খাবার নিয়ে আয়। যা—যা।

বললাম : আজ আর কিছু নয়। এক কাপ কফি ছাড়া।

ব্যাচারামও ছাড়নেওয়ালা নয় : সে কি হয় ? আপনি হলেন গিয়ে আমার পুরানো খদ্দের। লক্ষ্মী।

তারপর সামনের একটি বয়কে লক্ষ্য করে বলল : যা, বাবা যা। কেষ্ট ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে থাকিস নে। একটা মুরগীর রোষ্ট নিয়ে আয়। চট করে যা।

অসহায় ভাবে বললাম : আজ থাক। আর একদিন বরং খেয়ে যাব।

ঠিক তো ? চিরকালই ঠাণ্ডা কচুরি খেয়ে গেলেন। এবার সুদিন যখন এসেছে তখন কিন্তু সব শোধ নিয়ে ছাড়ব—হুঁ !

কফিতে চুমুক দিতে-দিতে আট বছর আগেকার স্মৃতি রোমন্থন করতে বসলাম দুজনে।

পরিচিতি, অর্দ্ধপরিচিতি অনেকের কথাই সে বলে গেল। বলল না কেবল একজনের কথা।

জিজ্ঞাসা করলাম : অবিনাশবাবুর খবর কি ?

ব্যাচারাম চুপ করে রইল একটু, তারপর বলল: বছর পাঁচেক হল তিনি গত হয়েছেন।

কী হয়েছিল?

কী যে হয়েছিল তা আর বুঝতে পারলাম কোথায়? লোকে বলে তাঁর মাথাটাই নাকি খারাপ হয়ে গেছল। খবর যখন পেলাম তখন সব শেষ। অত বড় মানী লোক! শেষ দিকটায় দুমুঠো ভাতও নাকি জুটত না।

ব্যাচারামের স্বরটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

পুরো একটি বছর ব্যাচারামের নিউকেবিনের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভদ্রলোককে আমি বসে থাকতে দেখেছি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক মাথা পাকা চুল; এবং সেগুলি অযত্ন-বিন্যস্ত। পরণে হাফ প্যান্ট। গায়ে একটি আধময়লা হাফ সার্ট। চোখে চশমা। সোজা খাড়াই সুঁচোল নাক। চওড়া কপাল। টক-টক করছে রঙ।

দেড়টা থেকে দুটো। ঐ আধঘণ্টা, কিংবা কিছু বেশী। চুরুট টানতে টানতে এক কোণে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকতেন। ব্যাচারাম ধীরে সুস্থে একটা ভাল শালপাতায় গরম-গরম কচুরি সাজিয়ে দিয়ে আসত ভদ্রলোককে। তিনি একমনে খেতেন। আর স্টেটসম্যান পড়তেন। মনে হতো সমস্ত দিনে-রাতে খবরের কাগজটুকু পড়ার মত সময়ও বোধ হয় তাঁর নেই। তাই এখানে বসেই সে-কাজটি শেষ করেন।

কারও সঙ্গে কথা বলতেন না তিনি। নিজের হাত-ঘড়ি ছাড়া কারও দিকে মুখ তুলে চাইতেন না। সময় মত উঠতেন, ব্যাচারামকে পয়সা দিতেন, তারপর বেরিয়ে যেতেন। সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটি মসৃণ নির্লিপ্ততা ছিল যে একবার দেখলে কিছুতেই তাঁকে ভোলা যেত না।

দিনের পর দিন কী একটা অদ্ভুত কৌতূহল নিয়েই না ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি!

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: ভদ্রলোকটি কে ব্যাচারাম?

ব্যাচারাম জবাব দিয়েছিল: পণ্ডিত মানুষ। মাটি-পাথর নিয়ে কী-সব কাজ-কারবার করেন।

সেদিনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম। নাম অবিনাশ সাহা। প্রত্নতাত্ত্বিক। সরকারের একটি দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। খবরের কাগজে অনেকবার এঁর নাম পড়েছি।

তারও বছর খানেক পরে।

রোটাস ফোর্টেই অবিনাশবাবুর সঙ্গে সেবার আমার প্রথম আলাপ হল।

নষ্ট স্বাস্থ্যটার ওপর খানিকটা পলেস্তারা বুলোতে সেবার গিয়েছিলাম ডেরি-অন-শোনে। সেখান থেকে রোটাস ফোর্ট মাত্র কয়েকদিনের জন্যে।

বেশী উঁচু নয়। হাজার আড়াই ফুটের কাছাকাছি। আয়তনও বেশী নয়। লোকালয় থেকে দূরে; কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্রামের জায়গাই বটে। প্রকৃতির আরণ্য প্রাচুর্যে যৌবনোচ্ছল। ফল, ফুল, লতা, পাতা, নুড়ি, পাথর দিয়ে কে যেন আকাশের বুকে একটি বাগান সাজিয়ে রেখেছে।

এক ছায়াচিত্র ছাড়া, প্রাচীন দুর্গের আজ আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। অসংস্কৃত পরিখা, দেওয়ালের রঙ চটে গিয়ে ইঁট-পাথরের বিকৃত অঙ্গ বেরিয়ে পড়েছে: উই, ইঁদুর, আরশোলা, চামচিকে আর বিষধর সাপে বোঝাই নবাব বাহাদুরের তক্ত-তাউস। নবাবের প্রমোদাগারে এখন সন্ধ্যার আগেই সুর ছড়িয়ে দেয় শেয়ালের দল। বেগম সাহেবার হারেমে নেমেছে পাহাড়ী ধ্বস। যেখানে হাজার বাতির ঝাড় জ্বলত, সেখানে আজ ভজুলালের টিমটিমে লণ্ঠন। হঠাৎ দেখলেই মনে হবে যেন ইতিহাসের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা হাওয়ায় উড়ে-উড়ে এখানে এসে আটকে গিয়েছে।

দুর্গ ছাড়িয়েই সমতলের সীমানা। নানা দেবদেবীর বিকলাঙ্গ মূর্তিতে সমাকীর্ণ। এদের দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। লোকালয় থেকে এত দূরে আড়াই হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় এতগুলি হিন্দুদেবদেবীর সমারোহ এল কেমন করে? দেহাতিরা বলে, এ সব আজকের নয়। সেই ত্রেতাদের আমল থেকে। অর্থাৎ হিন্দুরাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের সময় থেকে। রোহিতাশ্বের নাম থেকেই নাকি রোটাস।

এটাই এখানকার জনশ্রুতি।

সত্যিকারের ইতিহাস কী, তা নিয়ে কচকচি করার প্রয়োজন আমার নেই। আমি সাধারণ মানুষ, এসেছি সাধারণ মন নিয়ে বেড়াতে। সেদিক থেকে প্রকৃতি কোন ফাঁক রাখে নি। যেদিকেই চাই সারি সারি বিপুলায়তন বৃক্ষশ্রেণী প্রাগৈতিহাসিক স্বাক্ষর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উঁচু-নিচু পাথরের ওপর তৃণগুল্মের স্বচ্ছন্দ বিহার। দুকূলপ্রসারি শূন্যতা হাজার-হাজার ডানার ঝাপটায় মুখর। বনের মধ্যে এগিয়ে যাও, অসংখ্য বানরের কিচির-মিচির। আরও

গভীর বনে গেলে দেখতে পাবে দুচারটে চিতা আর হরিণ, ছোট-ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা, দু-চারশ বিহারী চাষীর ঘর, ছোট-খাট যব-ভুট্টা-মকাই-এর ক্ষেত।

পরিপূর্ণ বিশ্রামের জায়গাই বটে।

আস্তানা নিয়েছি ডাক বাংলোয়। খাই, দাই, আর ঘুরে বেড়াই।

সেদিনটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডার দিন। উত্তর-পৌষের ঝড়ো হাওয়ায় দিগন্তব্যাপী শূন্যতার আর্তনাদ সুরু হয়েছে। অতিকায় ছায়াগুলি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে পাহাড়তলীর দিকে। আকাশে-মাটিতে একটা ছায়া-ছায়া মেঠো অন্ধকার নেমে আসছে, বর্তমানকে বোঝা যাচ্ছে না। সেই সময়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হোত, অতীত জগতের সব কিছু স্তূপীকৃত যাদুঘরের দরজা হঠাৎ যেন একটা মায়ামন্ত্র বলে আমার সামনে খুলে দিয়েছে কেউ।

আসন্ন সন্ধ্যায় ঘুরতে-ঘুরতে কখন যে পাহাড়ের এই দিকটায় এসে পড়েছি তা বুঝতে পারি নি। অনেকক্ষণ ধরেই কানে একটা শব্দ আসছিল। অনেকটা জমাট পাথরের ওপর শক্ত লোহার জিনিস দিয়ে জোরে-জোরে ঘা মারলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম। প্রথমটায় খুব বেশী আমল দিই নি। কিন্তু বুঝলাম, ঐ শব্দটাই আমাকে নিজের অজ্ঞাতে টেনে নিয়ে চলেছে।

সজাগ হয়েই দেখলাম আমি একটি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এটিকে আগেও অনেকবার দিনের আলোতে স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করেছি। বিরাট গোলাকার একটি মন্দির। তিনটি পাশ তার জীর্ণ। মাথার গম্বুজটি দীর্ঘায়তন। সাপের দেহের মত পাকিয়ে-পাকিয়ে ওপরে ওঠে গিয়েছে। গম্বুজেব সমাপ্তি হয়েছে একটি ছত্রাকার পদার্থে। চারপাশে ঝোপ-ঝাড-কাঁটা গাছ খানা আর খোঁদল।

পাহাড়ের একেবারে প্রত্যন্ত দেশে এই বাসুকীর মন্দির। কতদিন আগেকার জানি নে। এটি কোন্ সভ্যতার নিদর্শন, তাও আমার অজানা। হয়ত, কোন একটি বিশেষ সভ্যতার নয়; অনেক সভ্যতাই এর ওপর রঙ বুলিয়েছে। একদিন নয়, দুদিন নয়, বছরের পর বছর ধরেই এর গঠনকার্য চলেছিল। একদিন নিশ্চয়ই এখানে জনসমাগম ছিল, আয়োজন ছিল, উৎসব ছিল। ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া আজ আর কিছু নেই। মানুষ আজ সযত্নে এড়িয়ে চলে একে। শুনেছি বছরে মাত্র একবার নাকি এদিকে দেহাতিদের কিছু ভিড় হয়। সেদিনটা হল নাগপঞ্চমী।

ঝোপের আড়ালে মানুষের শব্দ শুনে কৌতূহল হল। এগিয়ে গেলাম একটু। জনকয়েক লোক সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। উঁকি মেরে দেখলাম, মন্দিরের ভেতর একটা আলো জ্বলছে। আর কয়েকজন লোক মেঝের ওপর গাঁইতি মেরে কী যেন খুঁড়ে-খুঁড়ে চলেছে।

ব্যাপারটা বোঝার মত নয়। বুঝতেও পারলাম না। বাইরের লোকগুলির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সেখানেও বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

একটু পরেই মন্দিরের সবাই বেরিয়ে এল। টেনে আনল একটি পাথরের ফলক। হাত তিনেকের বেশী বড় নয়। কাদা-মাটিতে ম্লান। ফলকের গায়ে কুঁদাই করা কয়েকটা মূর্তি। অপরিচ্ছন্নতার জন্যে মূর্তিগুলি ঠিক কিসের বুঝতে পারলাম না। হ্যাজাকের আলোয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু নজরে পড়ল তা থেকে এটুকু অনুমান করলাম যে মূর্তিগুলি সভ্যজগতের নয়, অনার্য দেব-দেবীর এবং প্রাচীন তো বটেই।

সকলের শেষে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে এক মুহূর্তেই চিনে ফেললাম। তিনি আমাদের ব্যাচারামের নিউ কেবিনের ডঃ অবিনাশ সাহা।

অবিনাশবাবুর দল অদৃশ্য হতেই দেহাতিদের চাপা উত্তেজনা মুখর হয়ে উঠল।

এই উত্তেজনার কারণ কী, তাদের প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। যেটুকু পারলাম তা হচ্ছে এই, যে-বস্তুটিকে অবিনাশবাবুর দল এইমাত্র চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলেন সে-টি আর কিছু নয়, এদের দেবতা। জাতে সর্প, রূপে কুৎসিৎ, মেজাজে ভয়ঙ্কর।

ভাবতে-ভাবতেই ফিরছিলাম। সর্প-দেবতাই বটে। কবে, কত যুগ আগের কথা। এই পাহাড়ের ওপর মানুষের পূর্বপুরুষেরা যখন প্রথম অনধিকার প্রবেশ করতে এসেছিল, তখন এখানকার বনেদী বাসিন্দারা নিশ্চয়ই তাদের বিনাযুদ্ধে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে দেয় নি। কত মানুষ যে এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তারও হয়ত শেষ নেই। তারপর যুদ্ধশ্রান্ত পরাভূত সাপের দল একটু একটু করে হটেছে। মানুষ ঘর বেঁধেছে, সমাজ গড়েছে। কিন্তু সাপের অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে নি।

মৃত্যুর আসল রূপটা মানুষের কাছে কোনদিনই সুন্দর হয়ে দেখা দেয় নি মৃত্যুকে সে চিরদিনই কুৎসিৎ বলে জেনেছে, ভেবেছে, চিন্তা করেছে। আর যে-সাপ মানুষের কাছে মৃত্যুরই রূপান্তর, তাকে রূপ দিয়ে বাস্তব

করতে গেলে সে যে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়াবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে ?

সন্ধ্যার অন্ধকার কাটিয়ে আকাশে ফিকে চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে। আড়াই হাজার ফিট ওপরে ঘন অরণ্য আর পুরাবস্তুর ঐতিহাসিক পরিবেশে সেই চাঁদের আলোও কেমন যেন ঘোলাটে। জেল্লা না থাক, অন্ধকারের গাঢ়তা কেটেছে। পৃথিবীটাকে পরিষ্কার দেখা না যাক, আকাশটাকেও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমতল মসৃণ অন্ধকারের বদলে কেবল চাপ-চাপ ঘন অন্ধকারের গাঢ়তা এখানে-ওখানে। সেই আলো-অন্ধকারের সরু গলি দিয়ে পথ হাঁটছিলাম আমি।

প্রাচীন দুর্গের পাশ দিয়েই আমার রাস্তা। দেখলাম, সেই দুর্গের পাশেই কয়েকটা তাঁবু পড়েছে।

সেইখানে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটির সন্ত্রস্ত গতি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলাম : কি ব্যাপার ?

আমার মুখ থেকে বাঙলা কথা শুনে লোকটি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল : যাক বাবা, বাঁচলাম। আপনি বাঙালী। তা'লে চলেন গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি।

কোথায় ?

ঐ ক্যাম্পে। সাহেব মুচ্ছো গেছেন।

হঠাৎ ?

একটু বিরক্ত হয়েই বলল লোকটি : কি জানি বাবু। সবেমাত্র ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামিয়েছি আর অমনি সাহেব দৌড়ে এসে পাথরটাকে খোঁচাতে লাগলেন। কত করে নিষেধ করনু, বাবু, উ হল গিয়ে ভূতড়ে দেবতা, ওটারে ছাড়ান দেন। তা কে শুনবে ? ভূতের নাম শুনলে সাহেবো যেন গোঁ চেপে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর ?

লোকটি বলল : আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন সাহেব, তারপরেই আঁ আঁ করে ধপাস। চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। সেই থেকে আর মুচ্ছো ভাঙে নি। আমাদের ভজুলাল অনেক ঝাড়-ফোঁক জানে। তারেও সঙ্গে লই। এ-সব পাহাড়ী ভূতের ফেরই আলাদা।

ভজুলালকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুজন এগিয়ে গেলাম। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেই ভজুলাল বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে দেখি, অবিনাশবাবু একটি খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছেন। পাশে বসে একটি মহিলা তাঁর মাথায় জলের পটি দিচ্ছেন। খাটিয়া থেকে একটু দূরে ছোট্ট একটা হ্যাজাক জ্বলছে, আর একপাশে সেই শিলাস্তূপটি হেলান দিয়ে দাঁড়-করানো রয়েছে।

ঠিক এই অবস্থায়, আর এই রকম একটি পরিবেশে কোন মহিলাকে দেখতে পাব, আশা করতে পারি নি।

আমার মুখের দিকে চেয়ে লোকটি বোধ হয় ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাই সে হঠাৎ বলে উঠল: মেম সাব, কিছু ডর নেই আপনার। এক বাঙালীবাবুকে পাকড়িয়ে এনেছি। আর এই ভজুলাল। ভূতের ওঝা। ওর কাছে আর চালাকিটি চলবে না, বাবা। ভজুলাল, বার কর তোমার যন্তর।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন: উনি এখন ঘুমিয়েছেন। চলুন আমরা পাশের ক্যাম্পটায় যাই।

তারপর সেই লোকটির দিকে চেয়ে বললেন: হরিহর, ভজুলালকে নিয়ে তুমি ঐ রাস্তার মোড়টা আটকাও। পাহাড়ী ভূত ঐ পথ দিয়েই আসতে পারে।

দুজনে ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় ভদ্রমহিলাকে দেখার সুযোগ হল এবার। ঋজু চেহারা, সুষ্ঠু গঠন। সাধারণের চেয়ে লম্বা একটু বেশীই। পরিষ্কার ঝরঝরে। গৌরবর্ণ মুখের ওপর বড় বড় দুটো চোখ। বয়স চল্লিশের ওপরেই হবে। আমার আন্দাজ, কিছু বেশীও হতে পারে। কিন্তু সমস্ত শরীর জুড়ে এমন একটি কর্মঠ ভাব, যা সাধারণ কেন, অসাধারণ অনেক ভারতীয় নারীর পক্ষেও বিরল।

ভদ্রমহিলা বললেন: হঠাৎ ব্লাড-প্রেসারটা বেড়ে গিয়েছিল। ওষুধপত্র সবই আমার কাছে ছিল। কোন রকম অসুবিধে হয়নি।

বললাম: আমি কাছেই থাকি। প্রয়োজন হলে ডাকতে দ্বিধা করবেন না।

ভদ্রমহিলা আবার একটু হাসলেন, বললেন: ধন্যবাদ। ভাবছি, কাল ভোরেই রওনা হব। এখানকার কাজ তো মিটেছে। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন আমাদের···

বললাম : আনন্দের সঙ্গে।

ট্রেনে তুলে দিয়ে আমাকে আর মিসেস সাহাকে একান্তে ডেকে ভজুলাল বলল : একটা কথা হুজুর। উটি বড় ভীষণ দ্যাবতা। সাপ হয়ে ছোবল মারে, আর গরু হয়ে ঘাড় মটকায়। বংশকে বংশ নিব্বংশ করে দিলে হুজুর। সাহেব একটু ঘুমোলেই ওটাকে গড়ায়ে দেবেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সবেমাত্র ভোর হতে চলেছে। ডেহ্রি-অন-শোন মাত্র বাইশ মাইল পথ। ট্রেনের গতি বেড়ে উঠল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দূরে বিলীয়মান রোটাসের দিকে চেয়ে রইলাম। একটি প্রাচীন ইতিহাসের কাছ থেকে তীব্রবেগে ছুটে চলেছি আধুনিক সভ্যতার সীমাহীন ঘূর্ণাবর্তের দিকে।

অবিনাশবাবুও চেয়েছিলেন কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের দিকে। একটু পরে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : আজ আমার চোখের সামনে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগেকার একটি রুদ্ধ দরজা খুলে গেল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন পাঁচহাজার বছরের কাছাকাছি কোন এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশেই নাকি কেবল একটি সভ্যতা বর্তমান ছিল। তখন নাকি বাঙলাদেশে সভ্য মানুষ ছিল না। কিন্তু এ-কথাটা কোন দিনই বিশ্বাস করিনি আমি। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সঙ্গে আমার মতানৈক্য লেগেই ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ রাসেলকে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করাতে পারি নি যে সে-সময়ে বাঙলাদেশে একটি সুসভ্য রাক্ষস সভ্যতা বর্তমান ছিল, যার সংযোগ ছিল দক্ষিণ ভারতের উপকূল ভাগের সঙ্গে ; এবং বিহার আর উত্তর ভারতেও তার যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙলাদেশ ততদিনে পাথর, ব্রোঞ্জ, আর তামার যুগ ছাড়িয়ে কৃষিযুগে হাজির হয়েছে। বিরাট কৃষিশিল্পে তারা সে-যুগের অনুপাতে কম কৃতি ছিল না। এমন কি হাইড্রোজেন গ্যাসেরও ব্যবহার জানত তারা। আমার কথা কেউ ওরা বিশ্বাস করতে চায় নি। আজ এই পাথরই তা প্রমাণ করবে।

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠছেন অবিনাশবাবু। তাঁর কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। বেশ বুঝতে পারলাম, অন্ধকারের বুক চিরে তাঁর চিন্তাধারা তখন প্রাচীনতম বাঙলার অধুনা অবলুপ্ত শ্যামল আরণ্যছায়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিসেস সাহা বললেন : আমি জানি প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তুমি অনেক বড়।

অবিনাশবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন: আর কেবল রাসেলের কথাই বা বলি কেন? সে ইংরেজ। ইংলণ্ড নয় এমন কোন দেশের কোন গৌরবকেই ওরা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষই যে আজ নিজেদের আর্য বলে প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে—এটা কোন্ ধরনের ক্ষ্যাপামি? কোথায় সেই মুষ্টিমেয় আর্য? এই বিরাট ভারতে, সমুদ্রে জলবিন্দুর মত কোথায় তারা তলিয়ে গিয়েছে কে জানে? এক যুদ্ধপদ্ধতি আর সংঘবদ্ধতা ছাড়া, চিন্তা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা যে অনার্যদের কাছ থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে ছিল, সে-কথা অস্বীকার করি কেমন করে?

কলকাতায় ফিরে আসার কয়েক মাসের ভেতরেই আবার আমাকে বাইরে যেতে হয়। একবার নয়, পর পর কয়েকবারই। ফিরে এলেও অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করার সময় আর সুযোগ হয় নি আমার। এরই মধ্যে একদিন খবরের কাগজে ছোট্ট একটি সংবাদ বেরুল, এবং ব্যাপারটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বলেই বোধ হয় সংবাদটি আমার কাছে একটি বিশেষত্ব নিয়ে দেখা দিলে। সংবাদটি হল:

সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ অবিনাশ সাহা একটি পুরানো পাথরের চাঁইকে পাঁচ হাজার বছরের বেশী প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের নমুনা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতান্তর দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, শিলালিপির বয়স আনুমানিক একশত বৎসরের অনধিক। এই মতান্তরের ফলে ডঃ সাহা চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

এই ঘটনার পরে একদিন অবিনাশবাবুদের বাসায় হাজির হলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম মিসেস সাহা বাড়ীতে নেই। ডানদিকে স্টাডি-ঘরের দরজা খোলা। সেখানে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে অবিনাশবাবু একটা শিলালিপি একমনে পরীক্ষা করছেন। একপাশে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জার্মান ভাষায় লেখা গোটা দুয়েক বই। আর একপাশে মোটা বাঁধানো খাতার পাতা ওলটানো। ফাউনটেনপেনটা মুখ-খোলা অবস্থায় সেই খাতার ওপর পড়ে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে ভেতরে ঢুকে এলাম। ভ্রুক্ষেপ নেই অবিনাশবাবুর। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কাশতে হল একটু।

অবিনাশবাবু ঘুরে চাইলেন। একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন: কে? অলক নয়?

হ্যাঁ স্যার।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। অবিনাশবাবু আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক একবার জার্মান ভাষায় লেখা বই-এর পাতা উল্টে যান। র‍্যাক থেকে নতুন বই বার করে পড়েন। ম্যগনিফাইং গ্ল্যাস নিয়ে দৌড়ে যান শিলালিপির কাছে। নিখুঁৎভাবে পর্যবেক্ষণ করেন সেটিকে। ফিরে এসে নোটস লেখেন। আবার বই নিয়ে বসেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলাম আমি। কোন রকম ক্লান্তি নেই অবিনাশবাবুর।

হঠাৎ চমক ভাঙলো তাঁর। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন: শুনেছ নিশ্চয়।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল অবিনাশবাবুর, বললেন: আমি নাকি ভণ্ড, আমি নাকি প্রতারক। আমি নাকি স্যালো।

একটু চুপ করে থেকে বললাম: মনীষীদের মানুষে প্রথম-প্রথম স্যালো বলেই উড়িয়ে দেয়। মানুষের ইতিহাসে এর নজির কম নেই স্যার।

নিমজ্জমান লোক একটা কুটো ভেসে যেতে দেখলে যেমন করে লাফিয়ে ওঠে, আমার কথা শুনে তেমনি ভাবে লাফিয়ে উঠে অবিনাশবাবু বললেন: ঠিক বলেছ। জিনিয়াসরা জগতে চিরকালই পাগল।

বললাম: তবে আর দুঃখ কী, স্যার?

অবিনাশবাবু মাথায় একটা ঝাঁকনি দিয়ে বললেন: না, দুঃখ কিছু নেই।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলাম: আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন যে মহেঞ্জোদড়র আগে বাঙলাদেশে কোন সভ্যতা বর্তমান ছিল?

অবিনাশবাবুর কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাস ফুটে বেরুল: হ্যাঁ।

মিসেস সাহা ঘরে ঢুকলেন। পরনে শাড়ী। মাথায় বব-করা চুল। দুর্ভাবনার একটা ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে। কিন্তু সব কিছু ঢেকে দিয়ে যে জিনিসটি সবার আগে চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে তাঁর শান্তশ্রী। জলুসের চটক ছাড়িয়ে ফুটে বেরিয়েছিল লাবণ্যের অনায়াস মাধুর্য।

বাজার সেরে ফিরলেন মিসেস সাহা। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : হ্যালো, মিঃ বাসু, য়্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন ?

অবিনাশবাবু বললেন : অলকের সঙ্গে আমি একমত। জিনিয়াসকে মানুষ পাগল বলে উড়িয়ে দেয় প্রথম-প্রথম।

মিসেস সাহা একটু হেসে বললেন : আমিও। কিন্তু এগারটা বাজল। খাবার সময় হয়ে গেল, খেয়াল রয়েছে ?

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবিনাশবাবু। ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে, পোর্টফোলিয়ো হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন : এক্ষুনি একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যেতে হবে।

মিসেস সাহা একটু অবাক হয়ে বললেন : তার মানে আজ আর সন্ধ্যের আগে ফিরছ না ?

ফিরব, ফিরব। ডোন্ট ওরি।

আর কিছু না বলেই ডঃ সাহা হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ বুঝতে পারলাম, মিসেস সাহা একটি দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। জানালার ভেতর দিয়ে উত্তর-প্রভাতের রৌদ্রদগ্ধ তামাটে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

বললাম : আজ তা হলে উঠি।

মিসেস সাহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : সে কি ? আপনার সঙ্গে তো গল্প করাই হল না।

তারপর কারণে-অকারণে, সময়ে-অসময়ে অনেক দিনই অবিনাশবাবুদের বাড়ী গিয়েছি। অনেক সময়েই অবিনাশবাবুর দেখা মেলে নি। যখন মিলেছে তখনও যে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়েছি সে-কথাও জোর করে বলতে পারি নে। সব সময়ে একটা-না-একটা কাজে ব্যস্ত তিনি। কখনও গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রস্তরলিপি পড়ছেন। কখনও পুঁথি ঘাঁটছেন। কখনও কারও সঙ্গে আলোচনা করছেন। কখনও লিখছেন। আবার কখনও বা ক্লান্ত মনে চোখ বুজিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু মিসেসের সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। সেখানে আমার দ্বার অবারিত। কলিং বেল টেপার আবশ্যকতা নেই সেখানে। দরজায় কড়া নেড়ে ভেতর থেকে

জক-আসায় অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। সোজা অন্দরমহলে হাজির হতে আমার এতটুকু বাধে না।

এই মহিলাটি সত্যিই আমাকে বিস্মিত করে তুলেছিলেন। জাতে জার্মান। অবিনাশবাবু যখন জার্মানীতে গিয়েছিলেন, সেই সময়েই এঁদের আলাপ। মিসেস ছিলেন ললিতকলার ছাত্রী। সেই আলাপই পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। তারপর নিজের দেশ ছেড়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে চলে আসেন ভারতবর্ষে। সে-ও প্রায় কুড়ি বছরের ওপর। কত নিপুণভাবেই না নিজেকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন তিনি!

তবু মিসেস সাহাকে দেখে অনেক সময় আমার সেই গোলাপ ফুলটার কথা মনে পড়ে যেত। খুব বড় জাতের একটা গোলাপের চারা লাগিয়েছিলাম আমাদের তেতলার ছাদে টবের ওপর। সার্টন থেকে সরেস সার দিয়ে তৈরি করেছিলাম মাটি। দুবেলা নিয়মিত জল দিয়েছি। কিন্তু বহু-প্রত্যাশিত ফুল যখন ফুটল, তখন নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলাম আমি। গোলাপ ফুল যে এ-রকম বিবর্ণ, পাণ্ডুর, রক্তহীন হয়, নিজের চোখে দেখেও তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মিসেস সাহার সঙ্গে কোথায় যেন সেই-গোলাপ ফুলটার মিল রয়েছে।

অবিনাশবাবুর পাণ্ডিত্য যত বড়, সাংসারিক জ্ঞান তত কম। আশ্চর্য হই নে। এ-না হলেই যেন বেখাপ্পা দেখাত। কিন্তু জ্ঞান না থাক, মোটামুটি একটা নজর থাকলেও বোধহয় মিসেস সাহার কাজ অনেক সহজ হয়ে আসত। চাকরি ছাড়ার পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল তা বোঝার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। ক্রুদ্ধ গণ্ডারের গোঁ নিয়ে তিনি ইতিহাসকে তছনছ করতে এগিয়ে চলেছেন। বর্তমান তাতে ভস্মীভূত হয়, হক।

একদিন গিয়ে দেখি মিসেস সাহা অসুস্থ। শুনলাম, তিনদিন জ্বর ছাড়ে নি। অবিনাশবাবুর স্টাডি বন্ধ। বাড়ীতে নেই তিনি।

বললাম: দিদি, একি অত্যাচার সুরু করেছেন?

মিসেস সাহা একটু হেসে বললেন: সামান্য একটু জ্বর। তাই নিয়ে আবার মানুষে হৈ চৈ করে নাকি?

বিশ্বাস হল না আমার। সামান্য জ্বর নিয়ে ওঁর মত মহিলা নিশ্চয়ই বিছানায় পড়ে থাকতেন না। কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম। গোটা কপালটা পুড়ে যাচ্ছে।

চটে গিয়ে বললাম: এটা কিন্তু ডঃ সাহার অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, নিদারুণ কর্তব্যহীনতার পরিচয়।

মিসেস সাহা এবারে একটু হাসলেন, বললেন: তুমি বোধ হয় জান না ভাই, আমার জন্যে উনি অনেক কিছু হারিয়েছেন—আত্মীয়, স্বজন, সম্পত্তি। এখন ওঁর মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি—তাও বুঝি যায়-যায়। ওঁর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়। আমি বুঝতে পারি ওঁর জীবন আজ কী ভীষণ অশান্তিতে ভরে উঠেছে।

প্রতিবাদ করে বললাম: উনি আপনাব জন্যে অনেক কিছু হারিয়েছেন! আর আপনি ওঁব জন্যে বাপ, মা, ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, পরিজন —সব হাবান নি? কি, চুপ করে রয়েছেন যে? জবাব দিন?

মিসেস সাহা এবাব সত্যিই চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখের ওপর তখন হয়ত ভেসে উঠেছে কত সমুদ্র, পাহাড ছাডিয়ে রাইণ নদীর তীরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। ফলে-ফুলে ভরা শস্য ক্ষেত্র। কলহাস্য মুখরিত, বাপ-মা-ভাই-বোনেব স্নেহচ্ছায়া ঘেরা শান্ত একটি কুটিব! বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি-মাখানো কর্মক্ষেত্র। তাব সঙ্গে আশঙ্কা। সুদূব পশ্চিমে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। এখনও তাঁর গ্রাম বেঁচে বয়েছে কি না কে জানে?

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু হাসলেন মিসেস সাহা, তাবপব বিছানার তলা থেকে এক ছডা হার বাব কবে বললেন: অলক, ভাই, এটা বিক্রী কবে কিছু টাকা এনে না দিলেই যে নয।

আশ্চর্য হয়ে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম। অবিনাশবাবুর আর্থিক অবস্থা যে দিন-দিন খাবাপ হয়ে চলেছে তা খানিকটা আন্দাজ কবেছিলাম। কিন্তু সেটা যে নিঃশব্দে এতদূব এগিয়ে এসেছে তা জানতাম না। প্রচণ্ড রাগ হল অবিনাশ বাবুর ওপর। পাঁচহাজার বছর আগে বাঙলা দেশ সভ্য ছিল, না অসভ্য ছিল, তা প্রমাণ করে কোন্ স্বর্গলোক জয় হবে জানি নে, তবে এটুকু বুঝি যে এই ভাবে দিনের পব দিন একটি মহিলাকে বিপর্যস্ত কবার কোন অধিকাব নেই তাঁর।

বললাম: আমাকে মাপ করতে হল। ওটা আপনি বাখুন। অন্য ভাবে চেষ্টা করে দেখি কিছু করতে পাবি কিনা।

মিসেস সাহা ঘাড নেড়ে বললেন: তা হয় না অলক।

কথার মধ্যে উত্তেজনাব স্পর্শ নেই এতটুকু। অথচ তা দৃঢ় আর অপরিবর্তনীয়।

তবু আমার গোঁ চেপে গেল। তাঁকে দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি।

সন্ধ্যের পর হাজির হলাম ডাক্তার নিয়ে। স্টাডি ঘরে জমজমাট আড্ডা। আটদশ জন লোক এসেছেন। তাদের সঙ্গে অবিনাশবাবুর তুমুল তর্ক চলেছে। সেদিকে ঘৃণা মিশ্রিত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সোজা মিসেস সাহার ঘরে ঢুকে গেলাম। মিসেসের জ্বর একটু বেড়েছে। বুঝতে পারলাম স্টাডির হট্টগোলে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। মনে হল দৌড়ে গিয়ে সবাইকে হিড় হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে আসি।

আমার মনের অবস্থাটা মিসেস সাহা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মুখের দিকে চেয়ে বললেন: থাক গে। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

মাঝে-মাঝে রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করতাম মিসেস সাহাকে: আচ্ছা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত লোক থাকতে ডঃ সাহাকে আপনি আবিষ্কার করলেন কেমন করে?

মিসেস সাহা হেসে বলতেন: কলম্বাস যেমন কবে আমেরিকা আবিষ্কাব করেছিলেন।

মাঝে-মাঝে আমারও কেমন যেন মনে হোত। ঐ স্বাভাবিক চেহারাব মানুষটির মধ্যে কী একটি দুর্নিবার আকর্ষণই না রয়েছে! তবু, যে-যুগে গুণের চেয়ে সেল্সম্যানশিপেবই কদর বেশী, সে-যুগে অবিনাশবাবুর মত পণ্ডিত মানুষ যে কেবল ট্যাক্টের অভাবেই বানচাল হয়ে যাবেন এতে·আর আশ্চর্য কী? কত লোকই যে তাঁব কাছে আসতেন, কত অধ্যাপক থেকে ছাত্র! সবাই তাঁর সঙ্গে পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন, তর্ক করতেন। আর তাঁরই মতামত কাগজে ছাপিয়ে নিজেদেব নাম জাহির করে বেড়াতেন। অথচ এ-সব দিকে অবিনাশবাবুর বিন্দুমাত্র হুঁস নেই।

দু' একবার যে এ-ব্যাপাটাব দিকে অবিনাশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি নি তা নয়; কিন্তু প্রত্যেকবারেই হেসে তিনি উড়িয়ে দিয়ে বলতেন: আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স অনেক রয়েছে হে। দুচারজন পকেটমার কিছু করতে পারবে না।

মাসখানেক পরে। আমার একটা নতুন চাকরি হল। যুদ্ধের বিশেষ সংবাদ-দাতার কাজ।

মিসেস সাহাকে বললাম: দিদি, চললাম।

মিসেসের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন: আমাদের খুব কষ্ট হবে জানি। তবু তোমাকে বাধা দেব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

অবিনাশ বাবু কথাটা শুনে বললেন: বেড়ে চাকরি তো হে? বলিদ্বীপের দিকে যদি যাও তো কিছু পাথরের স্যাম্পেল এনো। দেখব তোমাদের আর্য সভ্যতার দৌড় কতদূর।

মিসেস সাহা হাসলেন। আমিও।

আমার সঙ্গে ওঁদের সেই শেষ দেখা। পরের ঘটনা ব্যাচারামের কাছে শুনলাম।

আমি কলকাতা ছাডাব পর অবিনাশবাবুর সাংসারিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল! শেষ পর্যন্ত মিসেস সাহা বাড়ীতে জার্মান ভাষা শেখাবার একটা ক্লাশ খুললেন। কয়েকটি ছাত্রছাত্রীও জুটল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে শ'দেড়েকের মত রোজগার হোত।

অবিনাশবাবুরা ছোট্ট একটা বাসায় উঠে গেলেন। দেড়খানা ঘবেব একটায় অবিনাশবাবুর মিউজিয়ম। আর আধখানা ঘরে মিসেসের ক্লাস।

সমস্ত দিনই মিসেস সাহা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। ঝি-চাকব আগেই চলে গিয়েছিল। সংসারের যাবতীয় কাজ কবে ছাত্রছাত্রীদের জার্মান শিখিয়ে দিন কাটছিল মিসেস সাহার। এর ভেতরেও কিন্তু অবিনাশবাবু প্রায় বেচারামের দোকানে আসতেন। বেচারামেব সঙ্গে তাঁর কেমন যেন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অবিনাশবাবুব জীবনযাত্রা হয়ত এইভাবেই গড়িয়ে-গড়িয়ে চলত। কিন্তু ভগবানের মার দুনিয়ার বার। সে যখন আসে তখন কোন সংকেত না দিয়েই আসে। দু একটা মাস যেতে না যেতেই পুলিশে হামলা জুড়ে দিল।

তখন স্টালিনগ্রাডে থমকে দাঁড়িয়েছে ফুরারের ক্লান্ত সৈন্যদল। তারপরেই নিম্নগামী প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মত রাশিয়ার বিপুল সৈন্যবাহিনীব চাপে জার্মান সৈন্যদল পিছু হটতে সুরু করল। সহরের পর সহর, জনপদের পর জনপদ, পাহাড়, পর্বত, নদী, ছাপিয়ে ভাটার স্রোতের মত জার্মান সৈন্যদল হটলো।

ঠিক সেই সময় ব্রীটিশ কলোনীতে তখনও যে-সব জার্মান সিভিলিয়ন বাইরে চলা-ফেরা করছিল তাদের জন্যে ব্রীটিশ সরকার বিব্রত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁরা ঠিক করে ফেললেন, এই সব সিভিলিয়নদের আর জেলের বাইরে রাখা

যায় না। রাখলে, ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত হতে বেশী সময় যাবে না। সুতরাং ভারতের যেখানে যত জার্মান সিভিলিয়ন ছিলেন, পোর সব জেলের ভেতর। এখন জার্মানী হারছে। জার্মান-বর্বরতার প্রতিশোধ নেওয়ার ভাল সুযোগ এর চেয়ে আর পাওয়া যাবে না।

আই-বি-র লোক যেদিন অবিনাশবাবুর দরজায় প্রথম ধাক্কা দিল সেদিন তিনি ব্যাপারটাকে নিছক পরিহাস বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বারবার যখন পুলিসে হামলা করতে সুরু করল তখনই তিনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি সরকারকে অনেকভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, যে-মহিলা গত কুড়ি বছরের ওপর নিজের দেশ, সমাজ, স্বজন ছেড়ে এদেশে চলে এসেছেন তিনি আর যাই হন, মনে-প্রাণে জার্মান নন। কিন্তু রাজ্য রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব যাঁদের মাথায়, অবিনাশবাবুর বিশ্বাসের ওপর তাদের আস্থা স্থাপন করার কথা নয়।

মিসেস সাহা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন: মিছিমিছি কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। ওরা আমায় ভালই রাখবে। ভাবছি তোমার জন্যে। তোমাকে কে দেখবে?

অবিনাশবাবু বললেন: আমার জন্যে ভাবছিনে। ভাবছি তোমার জন্যে। জার্মানরা ইংরাজদের ওপব যত অত্যাচার করেছে তার সব শোধ ওরা তুলবে তোমাদের মত জনকয়েক নিরপরাধ মেয়ে-পুরুষের ওপর। যে-যুগে মেয়েদের ওরা সম্মান করত, সেই সিভ্যালরির যুগ ওরা অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। ওরা আজ কাপুরুষ।

ইংরাজ-সরকার মিসেস সাহাকে শেষ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর থেকেই অবিনাশবাবুর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এল। তাঁর পড়াশুনা, তর্ক, লেখা, আলাপ, আলোচনা—সব ভোজবাজির মত বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর স্টাডির দরজা বন্ধই থাকত। কেউ এলেই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। সারাদিন চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে-বসে কাটাতেন।

একটানা দিন দশেক দোকানে না আসতেই ব্যাচারামের কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সে অবিনাশবাবুর বাড়ীতে হাজির হয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন: কাকে চাই?

অবিনাশবাবু এখানে থাকেন?

ভদ্রলোক একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আপনি তাঁর আত্মীয়

বুঝি? যাক; বাঁচালেন মশায়। আজ সাতদিন ভদ্রলোক দোর-দরজা বন্ধ করে বসে আছেন এক ভাবে। শেষ পর্যন্ত মারা না যান।

বেচারাম ঘরের ভেতর ঢুকে দেখে অবিনাশবাবু তাঁর স্টাডিতে একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। তখন বেলা দশটার কাছাকাছি। জানালা খুলে দিতেই সকালবেলার রোদ এসে গোটা ঘরে লুটোপুটি খেয়ে গেল। বেচারাম দেখল, অবিনাশবাবুর চেহারা এই ক-টা দিনেই ভেঙে পড়েছে। একমুখ দাড়ি গজিয়েছে। তার ওপর ব্লাডপ্রেসার বেশ কাহিল করে দিয়েছে তাঁকে।

বেচারামকে দেখেই অবিনাশবাবু কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকেন একটু। তারপরেই দাঁড়িয়ে উঠে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে থাকে।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অবিনাশবাবু বললেন: জান বেচারাম, ওকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে?

সেবার বেচারামের সেবায় আর যত্নে অবিনাশবাবু সেরে উঠলেন। বাইরে বেরলেন আবার। কিন্তু আগেকার অবিনাশবাবুকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মনের কোথায় কে যেন একটা বিরাট মোচড় দিয়ে তাঁর জীবনী-শক্তিটাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

শেষপর্যন্ত বাড়ীটাও ছাড়তে হল। বাড়ীওয়ালাকে ভদ্রলোকই বলতে হবে। পুরো দুটি মাস সে এক পয়সাও ভাড়া পায়নি। পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। অবিনাশবাবুর রোজগার নেই। খাবারও আসত ব্যাচারামের দোকান থেকে। সব খবরই রাখত বাড়ীওয়ালা। তারপর একদিন লোকজন আর ঠেলা নিয়ে হাজির হল। তাঁর বই-খাট-বিছানা রাস্তায় বার করে, আর তাঁর সমস্ত জীবন ধরে সংগ্রহ করা ঝুড়ি-ঝুড়ি পাথরের নুড়ি, ফলক, মূর্তি সব রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে ঘরে তালাচাবি দিয়ে চলে গেল।

সংবাদ পেয়ে চলে এল ব্যাচারাম। অবিনাশবাবুকে ধরে নিয়ে এল নিজের বাড়ীতে। ওখানেই দিনকতক অবিনাশবাবু ছিলেন। তারপর একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন।

একটি মাস আর তাঁর কোন হদিস পায়নি ব্যাচারাম।

তারপর একদিন ভোরবেলা ড্যালহৌসীর পাড়ে তীব্র হৈ-চৈ শুনে দৌড়ে গেল ব্যাচারাম। একটা পাগল নাকি পুকুরে ডুবে মরেছে। পুলিশ এসে লাস তুলেছে তার।

ব্যাচারাম দেখেই শিউরে ওঠে। অবিনাশবাবুকে চিনতে দেরী হয় না তার।

ব্যাচারাম থামল। আমি মুখ নীচু করে ঠাণ্ডা কফির কাপটার দিয়ে চেয়ে রইলাম। কফির তলানিটা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। হয়ত আমার চোখ দুটোও। তবু এই আট বছরের আস্তরণ ভেদ করে আজও যেন অবিনাশবাবুর উজ্জ্বল ভাস্বর মুখটা অম্লানভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার। একটা অব্যক্ত বেদনায় গোটা শরীরটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ভাবলাম, হায়রে দেশ, এখানে কত সহজেই না প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে!

কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম জানিনে। হঠাৎ ব্যাচারামের গলার স্বরে চমকিয়ে উঠলাম: ওরে, বাবুকে আর এক কাপ গরম কফি এনে দে।

বললাম: আজ থাক ভাই।

ব্যাচারাম বলল: আপনারা গুণী লোক। কষ্ট তো আপনাদের হবেই। একটা মাস আমার মত গোলা লোকেরও যা করে কেটেছে!

উঠে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম: মিসেস সাহার খবর জান?

ব্যাচারাম বলল: হ্যাঁ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তিনি ছাড়ান পান।

তারপর?

তারপর তিনি এখানে এসেই ওঠেন। আমার কাছ থেকে সব শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন।

তারপর?

আমরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল কাজ করেছ ভাই। জানিনে জার্মানীতে ওঁর এখনও কেউ বেঁচে আছেন কিনা। তবু এত বড় শোকের পর জার্মানীর মাটিই তাঁকে হয়ত খানিকটা শান্তি দিতে পারবে।

ব্যাচারাম বলল: ওখানে গিয়ে চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন, আপনি যদি কোনদিন ফিরে আসেন, তাহলে আপনাকে যেন তাঁর ঠিকানাটা দিই।

আমার দৃষ্টি তখন জার্মানীর কোন একটি গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, রাইন নদীর ধারে সেই ছোট কুটির। আঙ্গুরলতায় ছেয়ে গিয়েছে চারপাশ। তারই সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস সাহা সুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে রয়েছেন। ভারতের মাটি কি তার চেয়েও অনেক বেশী দূর!

প্রত্যাবর্তন

কদিন থেকেই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে হরি ডোমের।

রূপনারাণের এ-অঞ্চলটা বিল, আবাদা, খানা-ডোবায় ভরা। পুব-পশ্চিমে সরু নালা গঞ্জ থেকে সেই মহেশপুর পর্যন্ত টানা। চোত-বেশেখে এ-সব নালায় জল থাকে না। শেয়াল-কুকুরও সাঁতরে পেরিয়ে যায়। কিন্তু শ্রাবণ-ভাদরের কথা আলাদা। রূপনারাণের ঢল নামে সেই নালায়। ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়ে যায় সব।

গঞ্জ থেকে পুব-পশ্চিমে, নালার ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে যাও মাইলখানেক। বড়-বড় শিরিষ, আমলকী, তেঁতুল, আম আর জামের অরণ্য। দু'চারশো খেজুর, আর বাবলা গাছ রয়েছে অজস্র, ফণিমনসা, আকন্দের ঝাড় হাজার-হাজার।

এ-অঞ্চলের তাবৎ মানুষের শেষ যাত্রার সীমানা এইখানে। ভৈরবী মহা-শ্মশান। এ শ্মশান আজকের নয়। একশো বছরেরও বেশী। আশে-পাশে দু'চারটে ভাঙা চালা ভেঙে-দুমড়ে মুখ থুপ্‌ড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। একদিন হয়ত কিছু লোকের বসতি ছিল এখানে। আজ আর কিছু নেই।

হ্যাঁ, আছে। ঐ হরি ডোম। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। মাথায় ঘন একরাশ চুল। দাড়িতে গোঁফেতে ভরপুর। বড়-বড় ভাঁটার মতো চোখ বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে তো ঘুরছেই। ব্যাটা পয়লা-নম্বরের গাঁজাখোর।

মড়া-পোড়ানোর কাঠ জোগান দেওয়াই এদের পৈত্রিক কর্ম। এর জন্যে কোন পয়সা দিতে হয় না ওকে। তবে প্রয়োজনবোধে সিকিটা-আধ্‌লাটা দিয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে হাঁড়িখানেক ধেনো। ব্যস্‌, দেখতে হবে না আর কিছু।

এই এখানকার রীতি। আবহমান কাল থেকে এ-ই চলে আসছিল। এখন এ-রীতি বদলেছে। তাবৎ সংসারে যখন সবই বদলাচ্ছে, আর মানুষের শেষকৃত্যই বলুন বা প্রেতকৃত্যই বলুন, যখন করতেই হবে, তখন এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা কচলিয়ে আর লাভ কী? তা ছাড়া, এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে হরি ডোমের পেটের দিকটাও তো দেখতে হবে। নিছক পেট-ভরানোর

হেঁপাও তো বড় কম নয় আজকাল। তারপর, তোমার বিজিনেস যদি মনোপলির চৌহদ্দিতে গিয়ে পৌঁছায়, তা হলে তো আর কোন কথাই নেই। তাবৎ সংসারে তোমায় ঠেকায় কে-টা?

সুতরাং হরি ডোম-ও তার মিটার চড়িয়ে দিয়েছে। মড়া-পিছু এক টাকা, কাঠ-কাটার দরুন আট আনা। তার ওপর খেনো। দিতে হয় দাও। না হলে রইল তোমার মড়া। কাক-শকুন-শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাক।

হেঁ হেঁ করে ওঠে অনেকে। বলে কি গুয়োটা! শেয়াল-কুকুর, কাক-শকুন! আরে রাম, আরে রাম! তাবৎ সংসারে মড়া নিয়ে নষ্টামি করিস্‌নে বাবা। নে, কিছু কমিয়ে নে।

লেখাপড়া শিখলে হরি দেশের কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারত। লেখাপড়া না শিখে শ্মশানের ডোম হয়েছে। তাই বলে কি সে ব্যবসা বোঝে না? খুব বোঝে! সেও ঘাড় নেড়ে বলে, কি কও গো কত্তারা? আজিকার দিনে এক সের মৎস্যের মূল্য হয়েছেন গিয়া তিন তংকা; আর কম্‌ছে-কম এক মণ মানুষটার দাম ধরেছি এক তংকা।

কথায় রয়েছে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। হরি ডোমের পাল্লায় পড়লে কর্‌করে দুটি টাকা তোমার খসবেই। তা করাই বা যাবে কী? মানুষ তো মরেই খালাস। তার আর কোন দায়িত্ব নেই। সব দায়-দায়িত্বই তখন হরি ডোমের। আর হরিকেই বা বলি কী? মড়া-পোড়ানো কাজটি কি সোজা মেহনতের কাজ রে, বাবা? কাঠ কাটো, চিতা সাজাও। চিতা সাজানোর আবার বিদ্যে থাকা চাই। কাঠের পর কাঠ সাজিয়ে গেলেই চিতা হয় না। ডান দিকে হেলবে না, বাঁ দিকে কাৎ হবে না। সামনে-পেছনে সমান-সমান। একপ্রস্থ খাড়াই, একপ্রস্থ উৎরাই। স্তরের পর স্তর। কোথাও সরু, কোথাও মাঝারি, কোথাও মোটা। জ্বলতে-জ্বলতে হেলে না পড়ে চুল্লীটা। তাহলেই বাছাধন কুপোকাৎ; মড়া আর তার বাহন দুই-ই। আধপোড়া তিনি হয়ত নাক-মুখ খিঁচিয়ে দেহ রাখলেন মা-ধরিত্রীর কোলে। তখন?

এসব কাজ এক হরিই পারে। যার যা ব্যবসা।

শ্মশানে মড়া এলেই হরি প্রস্তুত। পরনে প্রায় নেংটির মাসতুত ভাই। মাথায় গামছা। হাতে কুড়ুল। আবলুস কাঠের মতো কুচকুচ করছে তার দেহের রঙ। ওপারের সদর গেটের দরোয়ান। অপ্রস্তুত থাকলে তার চলবে কেন?

পাওনাগণ্ডা প্রথমেই মিটিয়ে নেয় হরি। এসব কাজে বাকি-বকেয়া নেই।

পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাত বাড়াবে হরি। অর্থাৎ ধেনো দাও। পদার্থ দিতে না পার, আর আনা-আষ্টেক ছাড়। খুচরা নেই? তা পুরোটাই দিয়ে দাও। এক সওদার জন্যে দুবার তো আর তোমার কাছে চাইবে না হরি। তা ছাড়া ভবপার কি সোজা রাস্তা কত্তা? সেখানে যাবার গেটপাস এত সস্তায় ত্রিভুবনে আর কেউ ছাড়বে না মশাই, ছাড়বে না।

আর ঘুষ? তা ঘুষের কথাই যদি বল বাপু, তালে সত্যি কথাটাই বলতে হয়। তাবৎ বিশ্বে ঘুষ খায় না কে-টা? আমি সোজাসুজি বলি; তোমরা ঠারে-ঠুরে বল। পেত্যয় না হয় তো, দারোগাবাবুর কাছে যাও গা।

প্রথম দর্শনেই মনে হবে লোকটা পয়লা-নম্বরের পয়সা-পিচেশ। তা না হলে যেখানের হাওয়া লাগলে মানুষ রাতারাতি সর্বত্যাগী ভোলানাথ বনে যায় সেখানে বসে ব্যাটা দু'আনা-ছ'আনা করছে!

তা এই ভবের নাটে কে পয়সা-পিশেচ নয় মশাই? বাপ-মা ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার—সবাই আপনার ট্যাঁকের দিকে তাক করে বসে নেই? কেবল একটু সুযোগের অপেক্ষা। ব্যস্, একবার কায়দামাফি পেলে দেবে বাপের নাম ভুলিয়ে। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, ভগবানও বড় জবরদস্ত ঘোড়েল, পয়সার গন্ধ পেলে জিব দিয়ে লাল গড়াতে সুরু করে। আর মানুষ তো সয়তানের বাচ্চা।

তবে হ্যাঁ। এই পর্যন্তই যা টানাহেঁচড়া। কাজে কোন গল্‌তি নেই হরির। প্রথমেই সে গড় হয়ে প্রণাম করবে। আপনাকে, না মড়াটিকে, না শ্মশানকে—বোঝবার উপায় নেই। তারপর মেপে নেবে মড়াকে। লম্বায় ক'হাত; চওড়ায় ক'হাত। মাটিতে দাগ কেটে পুঁতবে খুঁটো। তারপর চিতা সাজানো চলবে। একটি কাঠ এদিক-ওদিক হওয়াব জো নেই। হাঁটু গেড়ে বসবে। চিতার ভেতর উঁকি মারবে। হাত দিয়ে কাঠগুলোকে খাঁজে খাঁজে বসিয়ে দেবে। চারপাশের খুঁটোগুলোর মাথায় শব্দ করে-করে রসিয়ে-রসিয়ে ঘা মারবে। খানিকটা পিছিয়ে যাবে। চোখ চিরে-চিরে দেখবে কোথাও কোন খুঁত রয়েছে কিনা। যাকে বলে নিখুঁত ঝরঝরে আর্টিস্টের মতো মুন্সীয়ানা। তারপর রূপনারাণের নালা থেকে একটু জল এনে ছিটিয়ে দেবে চিতার ওপর। হাজার হোক সে ডোমের বাচ্চা। কোন্ ঠাকুরমশায়ের দাহ হবে কে জানে! আর রূপনারাণই তো হল গিয়ে মা-গঙ্গার মায়ের পেটের ভাই। অধর্ম পাবেন না হরি ডোমের কাছে।

সব সেরে বলবে : বাবুরা, এবার গুঁয়ারে চড়ান।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটেছে হরির। জন্ম থেকেই কেটেছে। এখানকার নদী-নালা-বাদা-আবাদায়, ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে-বিলে দিন কেটেছে তার। দু'বিঘে নিষ্কর জমি চাষ করত হরির কাকা-জ্যোঠারা। ও-জমি ওদের অনেকদিনের। কতদিনের কেউ জানে না। হয়ত যখন থেকে গ্রামের পত্তনি হয়, সেই থেকে, পর-পর কয়েক বছর আকালের বাজারে সেটুকুও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। তারপর এল বন্যা-মহামারি-মড়ক কলেরা, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়ার রাহাজানি। ডোমপাড়া নিশ্চিহ্ন। অনেকেই পালাল। পালাল হরির ছোট ভাই কেষ্ট। আর পালাল হরির বউ দুলারি। হরিও পালাত ; কিন্তু পালাল না, গ্যাঁট হয়ে বসে রইল শ্মশানের ওপর।

কেন পালাল না সে-কথা একদিন হয়ত হরির মনে ছিল। আজ আর নেই। হয়ত বিতৃষ্ণায়। তাবৎ সংসারই একটা ভাঁটিখানা। চোলাই মদের আড্ডাখানা। দুদিনের মুসাফির। স্নেহ নেই, মমতা নেই, কিছু নেই। আছে কেবল জাল-জোচ্চুরি খুনখাবাপি-বাহাজানি। ধাপ্পায়-ধাপ্পায়, শঠতায়-প্রবঞ্চনায় ছেয়ে গেল দুনিয়া। তাব চেয়ে শ্মশান অনেক ভালো। এখানে বাবা, আর যাই চলুক, প্রতারণাটি চলবে না। এ বড শক্ত ঠাঁই। গাড়ী কর, জুড়ি কর, জালিয়াতি কর,—এর সঙ্গে চালাকিটি চলবে না যাদু। এখানে এলেই সব ঠাণ্ডা। সাত চড়ে রা বেরোবে না তোমার।

তাই রয়ে গেল হরি। একা, একেবারে একা।

ভয় করে না হরির ? না, ভয় কিসের ? ভয় তো মৃত্যুর। মরার বাড়া গাল নেই। জীয়ন্ত মানুষের কারবার অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে হরি। তাই আজ সে নির্ভয়।

মৃত্যু যাকে ঘাবড়াতে পারেনি, পোড়া পেট-ই তাকে নাজেহাল করে তুলল। আজ কদিনই বাজার বড় মন্দা চলেছে। কচিৎ কদাচিৎ লোক আসে। তাদের ভেতর আবার হাভাতে ঘরেরই বেশী। ওদের সবাই প্রায় উইদাউট বা 'হাফ' টিকিটের যাত্রী।

এর ওপর আবার ভাগীদার এয়েছেন ! একে মা ভাত পায় না, আবার কেষ্টারে ডেকে আন। গোদের উপর বিষফোঁড়া ! ছোঁড়া আমার সাতজন্মের ভাগীদার। ব্যাটা সয়তানীর বাচ্চা কোথাকার। বুকের ভেতর অনেকদিনকার পুরানো একটা ঘা যেন হঠাৎ চনচন করে উঠল হরির।

মুখে সাম্রাজ্যের বেজার নিয়ে কথা বলে হরি।

কি র‍্যা? বলি, ব্যাপারটা কি—অ্যাঁ!

ব্যাপার আবার কি গো? লিজের সম্পোত্তির ভাগ লিতে এলুম।

মনে মনে খেঁকিয়ে ওঠে হরি। সম্পোত্তি? ব্যাটা মাকড়া কমনেকার। শ্মশান আবার সম্পোত্তি, আর তাতেই উনি ভাগ বসাতে এয়েছেন!

গাঁজার কলকেটায় হুসহুস্ করে কয়েকটা টান মারে হরি। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে একটু তেবচা চোখে ভ্যাখে চণ্ডীকে। উনিশ-কুড়ি বছরের জোয়ান মদ্দ। এবই ভেতর হাতের পেশীগুলো লোহাব পাতের মতো দেখতে হয়েছে। বেশ বাড-বাডন্ত চেহারা। একমাথা ঘন কালো কুচকুচে চুলের ওপর বাববি-ছাঁট।

তা তুয়ার বাপটা কুথায় র‍্যা?

সে গুয়োটা মরছে। কলে চিপটা মরছে।

আব তোব জননীটা গেলা কমনে রে?

সে মাগীও কবে পিটটান দেছে।

হুম।

আব কয়েকটা গাঁজার টান ছাড়ে হরি। জোব জোব। হুঁ। শালা কালেব চাকা ঠেকায় কে-টা। বড শক্ত ঠাঁই রে, বাবা, বড শক্ত ঠাঁই। এ দুনিয়া অসুরেব পাঁজবা দিয়ে তৈবী। হরি মনে মনে সদ্‌বচন আওডাতে চেষ্টা কবে। দৈত্য-দানো-বাক্ষস-খোক্কস-ই হল গিয়ে এখানকাব আস্‌লি বাসিন্দে।

তা সম্পোত্তি চাও?

চণ্ডী ঘাড নাডে। অর্থাৎ চায়।

আর একমুখ ধোঁয়া ছেডে হবি বলে, আজকাল অবিশ্যি রেট একটু বাডছে। তবে ক'পযসা আব কামনাবি?

চণ্ডী উদাসভাবে জবাব দেয়, যা হয়।

তুমি হলে গিয়ে লগরবাসী নোক। এসব ধকল সইবা তো?

চণ্ডী বলে, পেরাধীন হওনেব চাইতে স্বাধীন ব্যাবুস্থা অনেক ভালো।

হঠাৎ ধমকে ওঠে হবি, বেবস্থাটা আবার দেখলা কুথায় শুনি? এ নালায় জল থাকে কুল্লে চাব মাস। দূর হতে ঐ ক'মাসেই যাহোক ওনারা আসেন। তারপর ব্যস্।

ব্যস্ কি গো? কও।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে চণ্ডী, বুঝলানা! তরপর গোটা বছরই শেয়াল-কুত্তায়

কাতরে মরে। আজকাল শালার ডাক্তার-বদ্যিও হয়েছে অঢেল। মারি তো সেই ন'মাসে ছ'মাসে। লোক মরবা ক্যামনে? ঐ যাঁরা না মরলি লয়, তাঁরা। তাও আবার শ্যামচকে লোতুন শ্মশান গজিয়েছে। বোঝ এবার।

চুপ করে থাকে চণ্ডী। মুখটা তার শুকিয়ে যায়, বা আগেই গিয়েচে। মাকড়ার মুখে অনেকদিন কিছু পড়েনি হয়ত।

হরি আবার বলে: কি? বাক্যিটা ধরল না মনে? বেশ, দু'চার রোজ দেখেই নেও। যদি বোঝ, থাকবা—থাক গে কেনে; তখন একটা ব্যাবুস্থা হবেক।

রয়েই গেল চণ্ডী। ছোঁড়ার হয়ত যাবার সত্যিই কোন ঠাঁই নেই। থাকলে, কেউ কখনও শ্মশানে দৌড়ে আসে?

কিন্তু এ তো বড় রংদার ব্যাপার? খদ্দের কোথায়? চণ্ডী হাঁ করে চেয়ে থাকে। রূপনারাণের খালের ধারে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে দু'চারটে পিরীতের গানও ছাড়ে ভিন্‌দেশী যুবতীদের দেখে।

হরি তাকে দেখে-দেখে প্রথম কটা দিন আড়ালে-আবডালে হেসেছিল। শেষের দিকে হাসির বদলে চিন্তা দেখা গেল মুখে। তারপর দুশ্চিন্তা। এই সাতটা দিন এ-হেন মহাশ্মশানে কাকপক্ষীর দেখা নাই! এ তো বাবা যে-সে শ্মশান নয়। ডাকসাইটে শ্মশান। কম্‌সে-কম লক্ষ মানুষের দাহ হয়েছে হেথায়। আলবাৎ হয়েছে। তা না হলে, অনেক রাত্রে ঘোর অমাবস্যায় ওনারা এখানে ঘোরাফিরা করেন কোন্ কম্মে? ওনারা তো আর হেঁজিপেঁজি জীব নন্। যেখানে-সেখানে ওঁদের গমন নিষেধ। দুদিনের পাতি শ্মশানেও ওনারা গেণ্ডুয়া খেলেন না। তাতে ওনাদের ইজ্জৎ নষ্ট হয়। আর ঐ যে নরমুণ্ডমালিনী ভয়ঙ্করী তিন হাত জিব বার-করা ভৈরবী! এক্কেবারে জাগ্রত। শব না হলে একটি দিনও ওঁর চলে না। এই মহাশ্মশানে দৈনিক একটি করে শব আসা চাই। আর তা আসছেও। সেই তিরিশ বছর ধরে দেখে আসছে হরি। সেই শ্মশান আজ ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে।

মনে-মনে ব্যাজরায় হরি। মাকড়াটার জন্যেই উৎপাত। কোথা থেকে একটা অপয়া, অলক্ষুণে অলপ্পেয়ে ছোকরা এসে জুটেছে! আজই তার শেষ দেখার পালা। কালও যদি কেউ না আসে তাহলে ঐ ছোঁড়াটাকেই মেরে পোড়াব। হ্যাঁ, তবেই আমি গদাই ডোমের পুত হরি ডোম।

পরের দিন সকাল থেকেই সুরু হয়ে গেল আবার। আসছে তো আসছেই একটা…দুটো…তিনটে…চারটে…

কে এলো গো ?

শ্যামপুরের দত্তবাড়ীর ছোট ছেলে।

আহা, এইত সেদিন ওঁর বিয়েতে হাজারটা বোম ফেটেছিল ?

হ্যাঁ, এখন নিজেই ব্যোম হয়ে গেল।

আহা, কচি বৌ…

বল হরি হরিবোল।

ইনি আবার কে গা ?

মুন্সীদের বড়বাবু দেহ রাখলেন।

তা, টাকার সিন্ধুকটা কার কাছে গচ্ছিৎ রেখে গেলেন গো ?

পাঁচ ভূতের কাছে…

আবার কে এলেন ?

বারুইদের মেজবৌ।

ঐ বেবুশ্যা মাগীটা !

সকাল থেকে সেই রাত পর্যন্ত কামাই নেই আর। শ্যামচক থেকে এসেছে, কল্মিজোড় থেকে এসেছে। এসেছে ভাটোরা, নিশ্চিন্দিপুর, গোপালনগর থেকে। সারি-সারি চিতা জ্বলে উঠল। শ্মশানের এ-উৎসব অনেকদিন দেখেনি হরি। নাওয়া-খাওয়ার ফুরসুৎ নেই। সবই মা-ভৈরবীর লীলে। ওস্তাদের মার কাকে বলে তারই একটা মহড়া দেখিয়ে দিলে মা কালী।

সেই রাত্রেই চণ্ডী বলল : জ্যেঠা, এবার একটা…

হরি অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। ছোঁড়ার চোখ দুটো চকচক করে উঠেছে। তা ওরই বা দোষ দেব কী ? করকরে টাকা দেখলে কার না লোভ

হয়? অবশ্য দেনেওলা সবাই নয়। তবে কিনা, শ্মশানে এসে এক ছিঁচকে ছাড়া তাবৎ সংসারে আর কেউ দর-কষাকষি করে না। মানুষই চলে গেল, তা আবার টাকা!

কিন্তু কথা তো তা নয়। কথা হচ্ছে তাগদের। স্রেফ মুখচাঁদ দেখে তো আর রূপচাঁদ মিলবে না। এ-সংসার বড় জবরদস্ত রে বাবা, বড় কঞ্জুস। গলায় গামছা দিতে না পারলে টাকা তো আসবেই না, অধিকন্তু সেই গামছাই গলার ফাঁস হয়ে ফতে করে দেবে তোমাকে।

মুখে বলে, তা ল্যাঙ। বাপ-পিতেমহের সম্পোত্তি লিবে এ তো হক্ কথা। কিন্তু কামটি করিয়ো মন দিয়ে।

সোজাসুজি বখরা হয়ে গেল দুজনের। মাসের প্রথম পনের দিন হরির। শেষ পনের দিন চণ্ডীর।

এই শেষ পনেরটা দিনই কাটিতে চায় না হরির। সকাল থেকেই সে বেরিয়ে পড়ে ছিপ নিয়ে। ঘুরে বেড়ায় নদী নালা খালে বিলে। কিন্তু মন বসে না। ছিপ তুলে এপাশ ওপাশ করে। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে গল্প করে। আবার ঘুরে-ফিরে আসে শ্মশানে। হয় দোরে বসে গাঁজার কলকে সাজে; না হয়ত, ভৈরবীর মন্দিরের চাতালে চুপটি করে বসে থাকে।

আর ওপাশে চিতা সাজাতে-সাজাতে হিমসিম খেয়ে যায় চণ্ডী। হরি ভ্যাখে আর হাসে। একি সহুবে মাকড়ার কম্ম রে বাপু? হাতের নিশানা কই? তড়বড় করে এক জায়গায় কাঠ বোঝাই করলেই হল? এদিকে কতগুল মোটা কাঠ, ওদিকে কতগুল লকড়ী। ষোলো, গুয়োটা ষোলো। ও-চুল্লির দফা সাফ। এক চুলও আগুন বেরুবে না। ধুঁয়ো, ধুঁয়োতে ছেয়ে যাবে চারপাশ। ভিজে কাঠ, শুকনো কাঠ, একটা ভিজে, একটা শুকনো দে রে বাবা। তার উপরে দ্যাও একটা শুকনো, একটা ভিজে। চোস্ত করে দাও চারপাশ। মাঝখানটায় ফাঁক। তারপর তানারে চড়াও।

চুল্লি সাজাতে-সাজাতে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে চণ্ডী। যতবার সাজায়, ততবার ভেঙে পড়ে। গোটা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে। মাঝে-মাঝে হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে আসে হরি। তার হাত থেকে কুড়োল ছিনিয়ে নিয়ে ঝপাঝপ কাঠ চেরাই শুরু করে দেয়। তারপর চিতা সাজায়।

ও ছোকরা আবার কে র‍্যা, হরি?

আমার ভাগিদার গো, ভাগিদার।

না, না, বাপু। এসব কাজ ও-ছোঁড়ার কম্ম নয়। হটিয়ে দে ওকে।

ঘাড় নাড়ে হরি। বলে, ওর পিতের সম্পোত্তি থেকে আমি হটাবার কে গো?

পনের দিন পরে হরির পালা আসে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। শ্মশানে পৌঁছে দিয়েই সব খালাস। বাকি সব কাজ হরির। অথচ চণ্ডীর পালায় কি নাকানি-চোবানি অবস্থা! বাপরে বাপ্। এই গেল, গেল! মড়াটা উল্টে গেল। চুল্লির দফা রফা। আরে বাপ্স্, কী ধোঁয়া!

দূর, দূর! ভাগাও ঐ ভাগাড়ের মড়াকে। মরা মানুষ, তাকে যতই অচ্ছেদ্দা কর, সে কথাটি কইবে না। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা বুয়েছ একবার। একেবারে মড়ার হাল করে ছেড়েছে ছোকরা! এ-যে এক ফ্যাসাদ হয়েছে রে, বাবা!

কয়েকটি মাস কাটল। সবাই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে চণ্ডীর ওপর। চণ্ডীও বোঝে কোথায় যেন তার একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সে যে ফাঁকি দেয় তা তো নয়। কাজ-ই তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। এত চেষ্টা করেও সে কারও মন জোগাতে পারছে না। না নিজের, না অপরের।

সেদিন দত্তদের মেজবাবু দুজনকে ডেকে আচ্ছা করে কড়কে দিলেন। বিশেষ করে চণ্ডীকে। তিনি স্পষ্টভাবে হরিকে জানিয়ে দিলেন—ও ছোকরাকে যদি দূর না কর তো তোমাকেই দূর করে দেব। দু'দশ মাইল থেকে লোকে মড়া নিয়ে আসে ও-ছোকরার মস্করা দেখার জন্যে নাকি?

আগে আগে হাসত হরি। এখন চটে যায়। মাকড়া কোথাকার! খদ্দের লক্ষ্মী। তাকে চটালে ব্যবসা চলে!

দাওয়ায় বসে হরি তামাক টানছে। ছোট একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে হাজির হল চণ্ডী।

চণ্ডীর দিকে চেয়ে হরি জিজ্ঞাসা করে, গমন হবেক কোথায় শুনি?

যে-দিকে দু'চক্ষু যায়।

এই মরেছে! ঐ যে কথায় আছে না. শুন ওলো গরবিনী রাই, তুমি না আসিলে মুই যথা-ইচ্ছে যাই। এ-যে হয়েছে সেই বিত্যান্ত রে বাবা! কবিত্বি, কবিত্বি। আরে মাকড়া, কাজ-কম্ম শিখে লিবি, তা লয়; রাতদিন কেবল আঁদারে-বাঁদাড়ে বেবাক ঘুরে মরতেছে। বুদ্ধু, বেয়াকুভ কমনেকার।

সেদিন দেখি, নালার পাড়ে বসে নল-খাগড়ার বাঁশীতে ফুঁ মারতেছে। কখনও কখনও উদাস দিষ্টিতে নদীর ঢেউ গনতেছে। এই বর্ষাবাদলের দিন। চারপাশে সাপ। কেউটে বল, গোখরো বল, চন্দ্রবোড়া বল, ঢ্যামনা বল, চিতেল বল, সব শালা ঢুকেছে গর্তে। দেবে কখন ছোবলে তার ঠিকানা নেই।

উত্তেজনায় ফসফস করে তামাক টানে হরি, আর মনে-মনে গজরায়: হুঁ বাবা, সব, সব বুঝি। হরি ডোম মায়ের প্যাট হতে পড়েই একেবারে তিন লাফে এত্না বড হয় নাই। পেরাণের জ্বালা আম্মিও কিছু বুঝি রে, আমিও বুঝি। তা বাপু, এ পোড়া শ্মশানে তোমার মনের জিনিস কোথায় পাবা, কও? এখানে পিরীত যদি করতে চাও তো ঐ শবের সাথে, পোড়া-কাঠ, আর ধেনোর সাথে পিরীত করো। মা-ভৈরবীর পেসাদ পাও। মনের জ্বালা সব জল হয়ে যাবে। আবে বাবা ডোমনীর বাচ্চা ডোম, তুয়ার আবাব সতীপনা কিসের লেগে বে মাকড! অত বড জোয়ান মরদ; হাঁড়ি-হাঁড়ি ধেনো গিল্‌গা। কাম শিখো, কাম করো। আর দুনিয়াকা কান মোচড দেকে রোপিয়া আদায় করো। ব্যস্। তা না, কেবলি বাঁশী বাজায়, আর পিরীতের গান গায়। গাড়োল কমনেকাব।

ঐ, ঐ চোখ দুটোই তোর খ্যায করছে রে মাকড়া!

রাগে গরগর করে ওঠে হরি: ক্যানে?

চণ্ডী বলে: ঐ যে দত্তদেব মেজবাবু। ওঁয়ার তডপানি ভালা লাগেনিকো মোর। বাক্যি তো লয়, ভোমবাব হুল।

হুঁ! আবার কুলো-পারা চক্কর! মানষেব শরীলটা তো আব ননীর পিতিমে লয় যে কথাব হুলে পেকে রস.গডাবে? এ হচ্ছে চামড়া। রোদে-জলে ভেজা, বোগে-মারিতে শুঁটকে মরা চাম। গরু-মহিষ-ছাগলের হলে এ-চামে জুতো তৈরি হোত, আর কালে তা হবে-ও বা। তা, কথার হুলেই যদি এতোটা টাল-মাটোল খাও তো, এ-পিবথিবীতে বাঁচবে ক্যামনে বাছাধন? সুতরাং যাবৎ সন্সারে বাঁচতে যদি চাও, ও-হুলের তাবৎ কথাটি বরবাদ করো—হ্যা।

মুখে বলে: তা বড়নোক মানুষ তো বটেক।

খেঁকিয়ে ওঠে চণ্ডী: বড়নোক তো মোর মাথা কিনছে আর কি। দেব একদিন ওই চুল্লীর ভেতর ঢুকিয়ে; তখন বড়মানষেমি বারায়ে যাবেখন।

আহা-হা! শিরদাঁড়া সোজা হয়ে ওঠে হরির। শুয়ো ব্যাটা শুয়োটা কয় কী? বাপ্‌রে বাপ্‌স্? এ-যে আসল খরিষের বাচ্চা। দত্তদের মেজবাবু বলে কথা; দশখানা গাঁয়ের জমিদার। তিনি ইচ্ছে করলে সব কিছু কর্‌তি পারেন। দরকার হলে, ঐ ভীমে ভৈরবীকে তুলে ঝপাং করে ফেলে দিতে পারেন রূপনারাণের ফাঁড়িতে। পয়সায়ালা মানুষ। তাঁরে ভগ্‌মান ডরেন। তু ব্যাটা কে লাটসাহেবের পুত্‌ রে?

মুখে বলে: চু-উ-প। শুনতে পাবা কেউ।

কোন উত্তর না দিয়েই চণ্ডী উঠে পড়ে। ছেলেটা কথা বলে কম; চিন্তা করে বেশী। বলে: আর তুমারও পাকা ধানে মই দিছি। তুমিও তো মোরে দেখতে নার।

মুহূর্তে ক্ষেপে ওঠে হরি। রাস্তার দিকে আঙুল নাড়িয়ে বলে: ঠিক বাত। ভাগ হিঁয়াসে। শালার যেমনি বাপ, তেমনি তার ব্যাটা। নিমকহারাম কাঁহাকার।

চণ্ডীর হাতের পেশীগুলি তার অজান্তেই ফুলে ওঠে। বিরাট ক্ষোভের রাক্ষুসে ঢল নামে তার শিরায়-শিরায়। চোখ-দুটো বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে।

সেও গর্জন করে বলে: চুপ যাও! নিমকহারাম মুই, না, তুমি?

কি! কি!—দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডীর বাবরি-চুলে হেঁচকা টান দেয় হরি।

জোয়ান ছেলে চণ্ডী। এইসা বুকের ছাতি। এক ঝটকায় হরির হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ায়। শিকারীর ফাঁকা গুলীতে ক্রুদ্ধ শার্দুল রুখে দাঁড়িয়েছে যেন। ফুলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু না, ঝাঁপিয়ে পড়ল না; অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলল: সব জানি। সম্পোত্তির ভাগ দিতে হয়েছিল; তাই মেজবাবুর ঠাঁয়ে গিয়ে মোর নামে ফুসকুনি গেয়ে এয়েচো। কিন্তু মুই-ও ডোমের পোলা। এই কথাটারে মনে রাখিয়ো।

দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল চণ্ডী।

ও, আমার ডোমের পোলা এয়েচেন! আমার চোদ্দ-পুরুষ! শালা, তুয়ার বাপটা যখন মোর বউটারে লয়ে…। ঘেন্নায়-হতাশায় মুখটা ফিরিয়ে নিল হরি।

সত্যিই তো, এ তার পাকা ধান। এই বিশ বছর ধরে কে এই শ্মশান জেগে রয়েছে র‍্যা? এই হরি ডোম! একা। আমার বাপ নাই, মা নাই, বেটা নাই, বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই। একেবারে নির্ব্বংশ। আর তা হবে নাই বা কেন? যে একবার ভৈরবীর খাতায় নাম লিখিয়েছে, ভৈরবী তার কিছু পিছ্‌টান রাখে

নাই। মায়ায় বদ্ধ জীব। পিছটান থাকলেই, সে সব ছেড়ে পিট্‌টান দেবে। হটতে-হটতে ফাঁক, ফরসা হয়ে যাবে একেরে। হুঁ···বাবা, তখন?

ওপারের চাবি নিয়ে বসে থাকা কি সহজ কাম রে বাবা? ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক আসছে। এ ইস্টিশনে জাহাজের মর্জিমাফিক, টেরেনের মর্জিমাফিক মনিষ আসে না। রূপনারাণের কানুন এখানে অচল। এতটুকু তর সইবে না মানষের। এসেই হাঁকবে: কে আছ হে? জল্‌দি আ যাও। জল্‌দি করো'।

একটু বেচোপ হওয়ার উপায় নেই। দরজা খোল, দরজা বন্ধ কব।

তারপর ঐ তেনারা। অমাবস্যার রাতে এসেই চিল্লাবেন: কই হে, কে আছে?

থাকবে আর কে? এই হরি ডোম।

শালার ঝকমারি হয়েছে এই চাকরি নিয়ে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে সে এই মহাশ্মশানের বুকে জেগে থাকবে? এই ভূত-প্রেত-দানোর রাজ্যে ছায়ার মতো সে টহল দিয়েই বা বেড়াবে কেন? না,ঐ রূপচাঁদির জন্যে। সে তো আর সত্যিকারের প্রেত নয। সে মানুষ। বাইরে সে হরি ডোম। ভেতবে তাজা একখানা মানুয। সেই মানুষেব অধিকারে ভাগ বসায় কে? সে চণ্ডী। হোক সে তাব ন্যায্য ভাগিদার।

গজরাতে-গজরাতে গাঁজায় টান দিয়ে যায় হরি।

ওদিকে খোল-করতাল বেজে উঠেছে। কে আসে? নিশ্চয় কোন পয়সাওয়ালা লোক। অনেক লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে নিশ্চয়। না হলে, মানুষ বড় লোক হয় ক্যামনে? এখানে পাওনাগণ্ডা ছাড়া উপরি-পাওনাও যথেষ্ট। না দিয়ে বাছাধন যাবে কোথায়?

শবাধারটি এসে দাঁড়াল শ্মশানে। অনেক লোক। নতুন খাট, নতুন গদী। এলাহি কাণ্ড।

কিন্তু আসল মানুষটি কোথায়? কোথায় হরি? হরির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নেশায় বুঁদ হয়ে বসে রয়েছে।

চীৎকারে হরির টনক নড়ল। অন্যদিন হলে সে দৌড়ে এসে সেলাম করত বাবুদের। আজ হঠাৎ তার সমস্ত শরীর একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। এই যাওয়া আর আসা। আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। এর যেন আর শেষ নেই।

কই হে, ও ডোম! আরে, বসে-বসে ঝিমুচ্ছ নাকি?

হরি বলে, এজ্ঞে, ঘোর তো আজ প্যালা নয় ; প্যালা হল গিয়ে চণ্ডর।

চণ্ড, সে আবার কে হে ?

হঠাৎ চমক ভাঙে হরির। চেয়ে ত্মাখে চারপাশে। না, চণ্ডী নেই। রূপ-নারাণের ধারে-ধারে দূর বনপথের দিকে একবার ফিরে তাকাল সে। না, চণ্ডী নেই। অনেক দুর চলে গিয়েছে হয়ত। যে গোঁয়ার ছেলে! হয়ত আর ফিরবেই না।

না, ফিরতেই হবে। এ শ্মশানের টান বড় জবর টান রে বাবা। একবার যে এসেছে, তাকে আর ফিরে যেতে হবে না। ঘুরে-ঘুরে আবার ঠিক ফিরে আসবে। চণ্ডীও আসবে ; না এসে পরেবে না।

বেলা বাড়তে লাগল। হৈচৈ করছে সবাই। কই হে? এখনও বসে? আয়রে বাবা, আয়। শেষ করতে যে দিন পুইয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত হরিকেই এগিয়ে আসতে হল। একসময়ে দাহও শেষ হল। পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনার অঙ্কটা হল মোটা। কিন্তু না ; অন্যদিনের মত আনন্দে বুকটা তার ফুলে উঠল না। টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে অনেক রাত পর্যন্ত ভৈরবীর চাতালে বসে রইল হরি।

এমনি করেই দিন যায়। কিন্তু হরি ডোমের সময় অচল, অনড়, পক্ষহীন। হঠাৎ বড় একা-একা লাগছে হরির। এতদিন তো সে একাই কাটিয়েছে। মহাশ্মশানের ডোম। ও প্রেতেরই সামিল। দিন-দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না সে। ঝড় জল, বজ্র-বিদ্যুৎ, আলো-অন্ধকার কোন অবস্থাতেই হরি শ্মশান ছাড়েনি। যে-কোন সময়েই তুমি হাজির হও, হরির দেখা মিলবেই।

হরি বলে—যে খেতে দেয়, পরতে দেয়, আশ্রয় দেয়, সেই তো মা। শ্মশান আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। অতএব শ্মশান-ই আমার মা-জননী। লাখ-লাখ মানুষের যাত্রা-পথের শেষ সীমানা এখানে। হোক না তা। হরির যাত্রাও হয়ত শেষ হবে এখানে। তা হোক। তবু এই শ্মশানই হরিকে প্রতিপালন করেছে ; আর করবেও। কোন্ সন্তান মাকে ভয় করে!

একটানা নিরবচ্ছিন্ন একা। সে আর এই মহাশ্মশান। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জীয়ন্ত মানুষকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে।

মাঝখানে মাস-কতকের ছেদ। ছোঁড়াটাকে দেখতে পারত না হরি।

মানুষের বাড়া-ভাতে ভাগ বসাতে এলে কে আর আনন্দে টগবগ করে ওঠে? শুধু রুজি-রোজগারই নয়। তার মাকেও কেড়ে নিতে এসেছিল ছোঁড়াটা।

ভালো লাগেনি হরির। মাকড়ার বোল্ যেন জলবিছুটির ঝাপট। যেখানে লাগবে, ফুলিয়ে ঢোল করে দেবে। ঠিক বাপ্‌কো বেটা। একেবারে বসানো কেষ্ট ডোম।

যাক্। ভালোই হয়েছে। আপদ-বালাই বিদেয় হওয়াই ভালো। আবার সে জাঁকিয়ে বসবে।

কিন্তু কই? তারই ওপর শেষ পর্যন্ত জাঁকিয়ে বসল একটা সীমাহীন নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। ছোকরাটা থাকলে তবু ঝগড়াটাও করা যেত। এখন যে বোবা হয়ে গেল লোকটা। ভূত ছাড়াতে গিয়ে, ওঝাই শেষ পর্যন্ত ভূত বনে গেল নাকি?

বোঝ একবার ছোঁড়ার কারসাজিটা।

বল হরি হরিবোল।

কই হে, হরি কোথায়? যা বাবা, হোথায় ঘুপটি মেরে বসে রয়েছ কেন?

আমার শরীলটা আজ ভালা নয়, বাবু। আপনারাই করে-কম্মে ল্যান।

আর দর বাড়াচ্ছ কেন বাবা! এস, পুরো ছ'টাকাই হল। আর ধেনো এক বোতল বাড়তি।

লোভে নয়। কর্তব্যের খাতিরেই উঠতে হল হরিকে।

আজ মাসের ক'তারিখ বাবু?

বিশ।

এখনও কদ্দিন মাস শ্যাষ হওনের?

তা দশ-এগারো দিন। কেন বল তো?

না, এমনি।

অনেক রাত্রে ঘরে এল হরি। চারপাশে চেয়ে দেখল। ছোঁড়ার ভাঙা সুটকেসটা পড়ে রয়েছে এককোণে। তারই ডালা খুলে গুনে-গুনে টাকা ছটো রেখে দিল? এ তো তার-ই। থাক্ জমানো। মাকড়া যদি কোনদিন ফিরে আসে।

কেটে গেল একমাস দেড়মাস। ভ্যাপসা আকাশের মত হরির শরীরটাও ম্যাজ-ম্যাজ করছে। আজ সাত-আটদিন সব আনাগোনা বন্ধ। কদিন বৃষ্টিটা বেশ জোরই হচ্ছে। শেষ-ভাদরের বৃষ্টি। যথেষ্ট তোড় রয়েছে। রূপনারাণ ফেঁপে উঠেছে। ভৈরবীর তলা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। পূজোর আর ক'টা দিনই বা বাকি? ঢাকের বোল উঠছে থেকে থেকে।

নিটোল ঘন আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রয়েছে হরি। আজ হাটবার। কিছু চাল কিনতেই হবে। এখন আবার তিনদিন হাট নেই। অথচ টাকা নেই একটিও। ছোঁড়ার স্যুটকেসে ক'টা টাকা অবশ্য রয়েছে। কিন্তু সে তো চণ্ডীর। যদি কোনদিন ফিরে আসে? পাওনাগণ্ডা সব বুঝিয়ে দিতে হবে তো। হরি আর যাই হোক, ঠকও নয়, জোচ্চরও নয়।

ভৈরবীর চাতালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে হরি: হেই মা ভৈরবী, তুমি জান মা, মোর কোন দোষ লাই। মেজবাবুর ঠেঁয়ে গেছ্লাম সত্য, কিন্তু বাজে কথা বলার বান্দা মুই লয়। মাকড়ার কামে মন নাই। কেবল বকের মতো ঘাড় ওঁচায়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে।

কোন সময়ে বা মরীয়া হয়ে বলত: হেই মাগো, ছাও-না ক্যানে, ছুটো চ্যালারে পাঠায়ে। লিয়ে আসুক মাকড়-টার ঘাড় মটকিয়ে। ছাও মা, আনিয়ে।

মাঝ রাত থেকেই বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু একটা অবিশ্রাম রিমঝিম-রিমঝিম শব্দ নিশীথ রাত্রিকে ভারাতুর করে রেখেছে। কাদের যেন কান্নায়-কান্নায় পৃথিবীটা আছড়ে পড়ছে বারবার। একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল হরির। মেঘে-ঢাকা আকাশের বুকে একটা নয়, অনেক-অনেক কান্নার স্রোত; আছাড়ি-পাছাড়ি কান্না আকাশ চুঁইয়ে-চুঁইয়ে অবিশ্রাম ঝরে পড়ছে।

সজাগ হয়ে উঠল হরি। তার এই দীর্ঘ স্মৃতিতে এমন কোন কান্নায় বোবা আর্তনাদ সে আর কখনও শোনেনি। এই দুর্মদ রাত্রির মধ্যে শেয়ালের দলও আঁৎকে উঠছে। একটা নয়, দুটো নয়, দলে-দলে, নিস্তরঙ্গ সময়ের বুকে আছড়ে-পড়া ব্যতিক্রমের মত, তারা চীৎকার করে উঠছে। গাছের মগডালে কারা যেন ঝুটোপোটি করছে। ঘর অন্ধকার। চারপাশে আথালি-

পাথালি অন্ধকারের জোয়ার বইছে; আর সেই স্রোত ঠেলে কে যেন অতি কষ্টে সাঁতরে বেড়াচ্ছে সেই ঘরের মধ্যে।

নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল হরি। চোর? না, ও-ভয়টি এখানে নেই। এক শেষ-যাত্রা ছাড়া, ও চোর-ই বল, আর ছ্যাচোড়-ই বল, কেউ ঘেঁষবে না এদিকে। তবে কি তেনারা? হরি ডোমকে তেনারা চেনেন। ঘর-বন্ধ, দোর-বন্ধ না দিয়ে হরি ঘরে ঢোকে না। তেনাদের সাধ্য নেই যে সেই মন্ত্র কাটিয়ে ঘরে ঢোকেন। তা ছাড়া, মা ভৈরবী যার ভরসা তার আবার ডরটা কিসের শুনি?

উঠে পড়ল হরি। বাইরে বেরিয়ে এল। না, রাত আর নেই। পুব আকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। শ্মশান ফাঁকা। ভৈরবীর মন্দিরে গেল হরি। সেখান থেকে নালার কাছে। দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

বল হরি হরিবোল!

ছ্যাঁৎ করে উঠল হরির বুকটা। কে এল এই সাত-সকালে।

এগিয়ে এল হরি।

জন-চারেক লোক। ভিন্‌দেশী-ই মনে হচ্ছে। শ্মশানের ঠিক মাঝখানটিতে নামাল শব। চিতা সাজাল হরি।

একটি লোক বলল: তুমিই আগুন দাও হে।

খ্যাঁক করে উঠল হরি: ক্যানে?

আরে বাবা, চটো কেন? বেওয়ারিশ মড়া কিনা! কেষ্টপুরের পোলের ধারে পড়ে ছিল। কলেরায় মরেছে কাল রাতে। এ তল্লাটের কেউ চেনে না ওকে।

ওঃ, তাই কন।

বেওয়ারিশ মড়ার মুখাগ্নি করে ডোমেরাই। হরি মড়াটিকে চ্যাংদোলা করে চিতার ওপর চাপিয়ে দিলে। তারপর আগুন ধরাতে গিয়েই থমকিয়ে দাঁড়াল।

পাতলা মেঘের আস্তরণ ভেদ করে প্রভাতের রঙিন আলো ফুটে বেরিয়েছে চারপাশে। এতক্ষণ তো কই নজরে পড়েনি। অনেকক্ষণ ধরে দেখল ব্যাপার। হ্যাঁ, গুয়োটা ফিরেই এসেছে। হেঁ, হেঁ। এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার রে বাবা? সহজ হলে, কবে সে পাঁই পাঁই করে দৌড় দিত।

তাড়া খায় হরি: অমন করে ঠাকুর দেখার মতো দেখছ কি হে? চারপাশে কলেরার মড়ক। অনেক কাজ আমাদের। চট্‌পট সেরে নাও।

হ্যাঁ, বাবু।

চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

সত্যিই মড়ক শুরু হয়েছে। মরছে, গাদা-গাদা লোক মরছে। শ্মশান বোঝাই . পর পর সাজানো শবদেহ।

কই হে? ও হরি! হরি!!

হরির ঘর খোলা। দাওয়ায় একটা মড়াখেকো কুকুর শুয়ে ছিল। সেই কেবল হৈচৈ দেখে মাঝে-মাঝে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠছে।

তাঁবুর পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল ডাক্তার। চারপাশে অনেকদূর জুড়ে বরফের রাজত্ব। চাপ-চাপ ঘন নীল বরফ। ধোঁয়াটে আকাশের তলায় পেঁজা তুলোর মত পাতলা বরফের ঝারি নেমে আসছে। আজ ক-দিন ধরেই অবিশ্রাম এই তুষারপাত চলেছে।

দিনগুলি মন্থরতায় ভরা। ডিসেম্বরের শেষ ক-টা ক্লিষ্ট, অসহায় দিন। স্ট্যালিনগ্রাডের বাঘা শীত তার সমস্ত ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আততায়ীর ওপর। যেন হাজাব-হাজাব ক্ষিপ্ত সিংহ নখদণ্ড বিস্তার করে দুর্বার আবেগে ভূপতিত শত্রুদলকে আঘাতের পর আঘাত হেনে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। প্রকৃতির এই নির্মম ভয়াল আক্রমণকে রোধ করবে কে?

এখানে দিনের জেল্লা নেই, নেই রাত্রির বহু প্রত্যাশিত প্রশান্তি। একটানা অন্ধকারে দিন আর রাত্রি অবলুপ্ত। ধোঁয়াটে পাংশুটে মেঘের আস্তরণে স্ট্যালিনগ্রাডের আকাশ ভারাক্রান্ত। এখানে দিন আর রাত্রির পার্থক্য কেবল শৈত্যের কিছুটা ইতর-বিশেষে। সেই ইতর-বিশেষেব ভেতরেই বা সত্যিকারের তারতম্য কতটুকু? দুরন্ত শৈত্যের ঝাপটায় হাঙরের দাঁতেব তীক্ষ্ণতা। যেন কেটে-কুটে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলতে চায় সব।

হিটলারেব দুর্ধর্ষ ষষ্ঠবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ করতে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর এই অজেয় বাহিনীর বিক্রমের কথা কে না জানে? জনপদের পর জনপদ ধ্বংস করে, রাশিয়ার একটি-একটি বুকের পাঁজর খসিয়ে নিয়েছে সে। আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত, আর হিটলারের অতি উদ্ধত গর্বের হাতিয়ার এই তিনশ সত্তর হাজার সৈন্যের বিপুল বাহিনী বিরাট পুরোভাগ নিয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে এসেছে। সামনে যা পড়েছে, সব তছনছ করে দিয়েছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি-জনপদ, কিছুই বাদ দেয় নি, রেহাই দেয় নি কাউকেই। তারপর স্টীম ফুরিয়ে-যাওয়া এঞ্জিনের মত হঠাৎ রাস্তার মাঝখানেই থেমে গিয়েছে এই বাহিনী।

থেমে যায় নি। হোঁচট খেয়ে থেমেছে। স্ট্যালিনগ্রাডের তুষার গ্র্যানাইটে

ঠোক্কর খেয়ে থেমেছে জার্মান বাহিনী। রাশিয়ার সৈন্য চারপাশ থেকে এদের ঘিরে এগিয়ে আসছে। সেই ক্রমসংক্ষিপ্ত বেড়াজালের ভেতরে যাঁতাকলে-পেশা ইঁদুরের মত মরতে হবে তাদের। এখান থেকে বেরোবার উপায় নেই। কয়েকটা দিন আগেও পিছিয়ে আসার একটা পথ খোলা ছিল। আর এও ঠিক হয়েছিল যে চারপাশের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সেনাদলকে একত্র করে মাইল আসটেক পিছিয়ে যাবে ষষ্ঠবাহিনী। তারপর শীতের প্রকোপ কমলে, আর উপযুক্ত রসদ আর সাহায্য এসে পৌছলে আবার তারা ফিরে আসবে। চারপাশে সাজ-সাজ রব উঠল। সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন য়্যুনিটে সংবাদ গেল। একটি মাত্র সংকেত পেলেই সব একযোগে পিছিয়ে যাবে। সেই সংকেতটি হ'ল "থানডার ক্ল্যাপ।"

কিন্তু 'থানডার ক্ল্যাপ' এল না। তার পরিবর্তে এল সুপ্রীম কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টারস জার্মানী থেকে সর্বাধিনায়ক হিটলারের চরম আদেশ। মং হুট। সেই আদেশ ওয়্যারলেশে ছড়িয়ে পড়ল ষষ্ঠবাহিনীর কেন্দ্রে-কেন্দ্রে। সৈনাধ্যক্ষেরা হতাশায় মুখ বিকৃত করল। অধঃস্তনেরা দুর্বল প্রতিহিংসায় বরফের ওপর বুটের গোঁতা মারল। সেনাবাহিনীর মানুষগুলি বোকার মত শত্রুদের শেল-গর্জনে উন্মত্ত তুষার-ঝরা আকাশের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সুযোগ, বেঁচে থাকার সমস্ত কিছু সুযোগ, হাতের মুঠোর মধ্যে এসে বিদ্যুতের গতিতে শেষবারের মত মিলিয়ে গেল আকাশে।

আবার সব চুপচাপ। যেন লাখ-লাখ সমুদ্র-উচ্ছ্বাস হঠাৎ কার যাদু-মন্ত্রবলে পাষাণ হয়ে গেল। আবাব অন্তর্ভেদী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেব বেদনার্ত হাহাকার; শ্লথগতি কুটিল সময়ের ভ্রূকুটি; দিনের মালিন্য, আব রাত্রির অস্বস্তি।

আলটিমেটাম শেষ হওয়ার ঠিক দু'টি মিনিট পরে, রাশিয়ানদের পাঁচহাজার কামান এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল। সেই সঙ্গে হাউটজার, আব মর্টার। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, আর দক্ষিণ দিকের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যেপে আনুমানিক দু'টি ঘণ্টা ধরে এই আক্রমণ চলল। আকাশের বুকে আগুনের চাঁদোয়া। রাশিয়ার অগণিত শক্তিশালী সতেজ সৈন্য, আর দুর্ধর্ষ তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রথম কিছুক্ষণ অক্রমণের দূরত্ব ছিল চারশ গজ; ক্রমশ সেই দূরত্ব কমে আসতে লাগল। স্ট্যালিনগ্রাডের তুষার মরুর বুক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জার্মানবাহিনী বিপর্যস্ত, ছত্রাকার। অস্ত্রশস্ত্র অকেজো। জার্মানদের বহু কামানের মুখ থেকে

একটি গোলাও বেরিয়ে আসার সুযোগ হ'ল না। রাশিয়ান আক্রমণ এত তীব্র, অকস্মাৎ আর বহুদূরব্যাপী।

হাজার-হাজার জার্মান সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আহত হ'ল তার চেয়েও বেশী। শত্রুপক্ষের অগ্নি-বিকিরণে জার্মান এলাকায় গাড়ী-গাড়ী পেট্রোল জ্বলতে লাগল। একসময় শত্রুদের কামান থামল, পিছনে রেখে গেল বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড।

যারা মরল, তাদের নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, যারা আহত হ'ল, তাদের নিয়েই ঝামেলা বাঁধল বেশী। যারা হাঁটতে পারল, তারা গুটি-গুটি এগিয়ে গেল ক্যাম্পের দিকে। যারা গড়িয়ে যেতে পারল, তারা গেল গড়িয়ে। যারা তাও পারল না, তারাই পড়ে রইল উন্মুক্ত প্রান্তরে। উপায় কী? স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক নেই এখানে।

এই আক্রমণের পরেই ষষ্ঠবাহিনী চারপাশ থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। খাবার, রসদ, ওষধপত্র নিয়ে আসার পথ প্রায় বন্ধ। এ-কদিন যেটুকু চলেছে সে শুধু বিমানে। আসার সময় তারা নিয়ে আসে গোলাবারুদ, আর শুকনো রুটি। যাওয়ার সময় বোঝাই করে নিয়ে যায় আহত মানুষ! কয়েকটা দিন আগেও এতটা চাপ ছিল না। সেদিনও সবাই চেষ্টা করত, যাতে মরণোন্মুখ সৈন্যেরা আগে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু আজ আর সে-সাহস নেই। রাশিয়ার বিমানধ্বংসী দূর-পাল্লার কামানের জন্যে বিমান আসা-যাওয়া এখন নিয়মিত নয়। ঠাণ্ডার প্রকোপ, খাবারের অভাব, রসদ আর ওষুধপত্রের চরম অনটন এদের স্বার্থপর করে তুলেছে। একটির পর একটি এরোড্রোমও জার্মাণীর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আহত হয়ে এখানে পড়ে থাকার অর্থ যে কী তারা তা সবাই জানে।

আজই একটা বিমান নেমেছে। সেই বিমানে ওঠার জন্যে আহতদের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখছিল ডাক্তার। বয়সে তরুণ, কিন্তু একটি করুণ হতাশা তার সর্বাঙ্গে। চারপাশে এই মৃত্যুর উৎসবের মধ্যে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার। না, ঠিক দাঁড়িয়ে নেই বিমানে আহতদের তুলে দেওয়ার কাজে সেও এতক্ষণ সাহায্য করছিল।

আহতদের বোঝাই করে বিমানটি উড়ে গেল। ডাক্তার অনেকক্ষণ তার গতিপথে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল তাঁবুর ভেতর।

ছোট তাঁবু। লম্বায় পনের ফিট, চওড়ায় দশ। কোন জানালা নেই। মাথার ওপর একটি মাত্র চারকোনা ফুটো। তারই ভিতর দিয়ে বাতাস যাওয়া আসার পথ। কয়েকটি অব্যবহার্য গাড়ীর লোহা-লক্কড় দিয়ে তাঁবুটি তৈরি করা হয়েছে। কোন্গুলির খাঁজে-খাঁজে কাগজ আর চটের বাণ্ডিল। এমনি করেই কোন রকমে বাইরে থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া বরফের গুঁড়ো ঝড়কে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। মানুষের শুকনো রক্তে মেশানো লাল বরফের গুঁড়ো।

মেঝের ওপর একটি কাঠের প্যাকিং বাক্স। তার ওপর হাত ধোয়ার বেসিন। দেওয়ালের গায়ে তার দিয়ে একটা সেল্ফ ঝোলানো। আর একটি অতি সাধারণ ষ্ট্রেচার চারটি পায়া দিয়ে মাটির ওপর দাঁড় করানো। তাঁবুর প্রায় দশ আনা জায়গা ষ্ট্রেচারটি দখল করে বসে রয়েছে। এইটিই ডাক্তারের অপারেশন টেবিল। গত কয়েক দিনে এর ওপরেই কয়েকশ রোগীর অপারেশন হয়েছে। তাঁবুটির সব চেয়ে অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি প্রচণ্ড শক্তির বৈদ্যুতিক নীল আলো। বর্তমানে সেটি শূন্য স্ট্রেচারের দিকে মুখ করে জ্বলছে। মাঝে-মাঝে বড় বীভৎস লাগে ডাক্তারের। শূন্যতা আর সীমাহীন ব্যর্থতা এই তাঁবুকে আজ গ্রাস করেছে, আর তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নিষ্ঠুর অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ।

ডাক্তারের হৃৎপিণ্ড নিঙড়িয়ে একটি দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল। এখনও অনেক রক্ত চাই। অনেক, অনেক। স্ট্যালিনগ্রাডের অনেক রক্ত চাই এখনও। চাইবেই তো! স্ট্যালিনগ্রাডের অনেক রক্ত অনর্থক পাত করেছে এই জার্মানরা। তার দেনা শোধ করতেই হবে।

রাশিয়া আক্রমণ করা যে কতবড় মূর্খতা তা ডাক্তার বুঝেছে। কেবল ডাক্তারই নয়। ডাক্তারের মত লাখ লাখ মানুষ, যারা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়, যারা মৃত্যু চায় না, জীবন চায়, যারা অপরকে নিরর্থক হত্যা করতে চায় না, সকলের সঙ্গে হাত আর মন মিলিয়ে বাস করতে চায়, তারা সকলেই বুঝেছে। ডাক্তার হাসে। এই রাশিয়ার সম্বন্ধে ফুয়েরের ধারণা কতই না ছোট ছিল। এরা নাকি যুদ্ধ করতে জানে না। এদের নাকি অস্ত্রশস্ত্র নেই। তিন সপ্তাহ, বড় জোর একমাস। তারই ভেতর রাশিয়া জার্মানদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। সেই ভরসায় বুক বেঁধে এক বছর আগে তিন লক্ষ সৈন্য মার-মার করে এই পথে এগিয়ে এসেছিল। জাতীয়তা আর ব্যর্থ অহঙ্কার

তাদের উদ্দাম করে তুলেছিল। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাদের? বন্ধু, বান্ধব, স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে বহুদূরে বিদেশী মাটির বেনামী ফাটলে বৃথাই রক্ত ঢেলে দিলে তারা। কিন্তু এত বড় প্রবঞ্চনার জন্যে দায়ি কে? বর্বর হিটলারের মত্ততা। লাখ-লাখ মানুষের এই যে অপচয় এর জবাবদিহী করবে কে?

কেউ না। রাইচস্ট্যাগ এখান থেকে অনেক দূরে। স্ট্যালিনগ্রাডে মানুষের এই আর্তনাদ সর্বাধিনায়কের কানে পৌঁছায় নি। ওয়্যারলেশ ফুরারের লেশমাত্র অনুকম্পা জাগাতে পারে নি। অথচ পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পিছিয়ে গেলে হয়ত এরা বাঁচত; কিন্তু হিটলার বাঁচত না।

কোথায় যেন শেল ফাটল। দূরের দিকে চেয়ে দেখল ডাক্তার। ছত্রাকারে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল বরফের টুকরো। তারপরে শোনা গেল একটানা মেসিনগানের আওয়াজ। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল ডাক্তার। এক্ষুনি হতাহতে তার তাঁবু ভর্তি হয়ে যাবে। অপারেশন মেটিরিয়্যাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন আমদানি না হলে, কাল থেকে আর কিছু করা যাবে না। এমনিতেই খুব সন্তর্পণে এগোতে হচ্ছে। যাদের না করলে নয়, তাদের ছাড়া আর কাউকেই অপারেশন করা হচ্ছে না। যারা মরবেই, তাদের পিছনে অনর্থক আর কিছু খরচ করা হয় না। উপায় নেই। আবার কবে বিমান আসবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে ডাক্তার।

কয়েকটা বছর আগেকার কথা মনে পড়ল ডাক্তারের। জার্মাণীর একটি হাসপাতালে হাউস সার্জেন ছিল সে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল। রাস্তার সামনে সবাইকে সামলে চলার নির্দেশ। কোথাও কোন গোলমাল নেই। ডাক্তার, নার্স, বেয়ারা সবাই ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে চলেছে। নরম সাদা ধোয়া চাদরে ঢাকা বিছানা। চিকিৎসার অফুরন্ত আয়োজন। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার যত রকমের উপায় রয়েছে তার কোনটিই বাদ যেত না সেখানে।

কিন্তু আজ? এ অন্য এক জগৎ। এখানে মৃত্যুই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক। এখানে আকাশে মৃত্যু, তাঁবুতে মৃত্যু, ট্রেঞ্চে মৃত্যু, বরফে মৃত্যু। মৃত্যুই এখানে স্বচ্ছ, সাবলীল, অনতিক্রমণীয়। এখানে প্রতিটি মুহূর্তে আকাশ, বাতাস, মানুষ কাঁপছে শেলের গর্জনে, মেসিনগানের অগ্নি-উদগীরণে।

ডাক্তার ভাবে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে স্ট্যালিনগ্রাডে এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের কথা মানুষ ভুলে যাবে। মানুষের মন থেকে আজকের এই তিক্ত স্মৃতি যাবে মুছে। হিটলারের অবিমৃষ্যকারিতার এই বর্বর কাহিনী, তাও হয়ত ভুলে যাবে সে যুগের মানুষ। হয়ত, আজকের এই বিরাট দুঃখ আর বঞ্চনার এক টুকরো কাহিনী লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতার কোন একটি অনাদৃত অংশে। তাও হয়ত হিটলারের কথা; যেমন লেখা রয়েছে নেপোলিয়নের কাহিনী; যেমন আমরা আজও ফেরবেলিনের যুদ্ধকাহিনী পড়ি; যেমন হাজার-হাজার যুদ্ধকাহিনীর টুকরো খবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ইতিহাসের পাতায়-পাতায় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হয়ে; এবং এও জানি, সেদিনের সেই মানুষ আজকের এই মানুষের আত্মত্যাগের বঞ্চনা বুঝবে না। আমরা পররাজ্য আক্রমণকারী বর্বর দস্যু বলেই প্রচারিত হব। সেদিনের ব্যাপারটি দুঃখের হলেও, আজ এই মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এ-কথাটিও বলতে আমাদের ক্ষোভ নেই যে আমরাই ভুল করেছি! শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আর অমরত্বের আদর্শ যে কত বড় ধাপ্পা তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আজ বুঝেছি, মরা আর মারার মধ্যে বীরত্ব নেই। বাঁচা আর বাঁচানোতেই সত্যিকারের বীরত্ব। আমরা এই সহজ সত্যটি অস্বীকার করে-ছিলাম বলেই স্ট্যালিনগ্রাডের বরফ গহ্বরে অনাবশ্যকভাবে জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাদের। ভবিষ্যতে যদি আর কোনদিন আমরা প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি, তা হলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এই সত্যটি আজ যদি কেউ ফুরারকে বোঝাতে পারে তা হলে সে জার্মাণীর সত্যিকারের উপকার করবে।

ক্রীং ক্রীং করে তাঁবুর টেলিফোন বেজে উঠল। ডাক্তারের চিন্তাধারায় বাধা এল। নেহাৎ যান্ত্রিকভাবেই রিসিভারটি তুলে নিল ডাক্তার। মিনিট-খানেক পরেই নামিয়ে রাখল।

নিজের মনেই একটু হাসল ডাক্তার। ৩৩৬ য়্যুনিটের সংবাদ—প্রচুর আহত আসছে। এবং একটু পরেই চারপাশ ভরে গেল। কেউ আসছে স্ট্রেচারে, কেউ হাঁটুতে ভর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কেউ আসছে বুকে ভর দিয়ে।

ডাক্তার জানে, তাঁবুতে এত লোকের জায়গা হবে না। জায়গা তো নেই, জিনিসও নেই। যাদের একেবারে না দেখলে নয় তাদেরই দেখতে হবে। বাকি সকলকে বসে থাকতে হবে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। বেছে-বেছে

কিছু ভেতরে ঢোকানো হ'ল। কয়েকজনের মুখের দিকে চেয়ে দেখল ডাক্তার। তাদের চোখ বোজা, কথা বলার শক্তি নেই, তাদের হৃৎপিণ্ডের ভেতর হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দুশ রোগী শেষ করল ডাক্তার। ডাক্তার জানে, এ চিকিৎসা নয়, চিকিৎসার ভাঁড়ামি। কিন্তু উপায় কী? এখনই দ্বিতীয় দল আসবে। তারপর তৃতীয়। তাদের জন্যে ডাক্তার করবে কী? তাদের সেই যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে অসহায়ের মত চেয়ে থাকে ডাক্তার। যাদের সে বাঁচাতে পারত, তারই চোখের সামনে তারা যন্ত্রণায় ছটপট করতে-করতে মারা যাবে। আর সেই দৃশ্য তাকেই দেখতে হবে! এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর পরিতাপ ডাক্তারের ভাগ্যে রয়েছে কী?

ডাক্তার বিড়-বিড় করে, যুদ্ধের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব জয় নয়, আহতদের সেবা, শুশ্রূষা।

তারপরেই হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, শয়তান; ফুরার একটা শয়তানের বাচ্চা।

ঠিক কথা। একশবার সত্যি।

ডাক্তার ঝটিতি ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, ৩৩৬ য়্যুনিটের লেফ্‌টন্যান্ট তার সামনে দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গে তার অসহণীয় ক্লান্তির একটা ছাপ পড়েছে।

বলল, ডাক্তার, কী করা যায় বলতো? রাশিয়ানদের দয়ার ওপর কিছুতেই আমি ওদের ফেলে যেতে চাই নে।

পশ্চিম ফ্রন্টে প্রায় দেড়শ লোক যুদ্ধ করছিল। তারা সবাই জখম হয়েছে। তাদের পক্ষে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ঘাঁটি ছেড়ে আপাতত কোন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় তাদের সরিয়ে আনতেই হবে। লেফ্‌ট-ন্যান্টের আদেশ, যেমন করেই হ'ক রসদের ট্রাকে উঠে যাও। তাই হ'ল। কোন রকমে ধুঁকতে-ধুঁকতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাকের দিকে। কিন্তু বিপদ হয়েছে আটজন জার্মান সৈন্যদের নিয়ে। তারা ফ্রন্ট থেকে একশ গজ ভেতরে ট্রেঞ্চে শুয়ে যুদ্ধ করছিল। তারাই জখম হয়েছে সব চেয়ে বেশী! তাদের পেট আর মাথায় চোট লেগেছে। কেউ তারা উঠতে পারছে না। অসহায় হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ তাদের তুলে আনার উপায় নেই। একটিও স্ট্রেচার বেয়ারা নেই সেখানে।

সমস্ত শুনে ডাক্তার বলল, যতক্ষণ না রাশিয়ানদের হাতে ওদের তুলে দিতে পারি, ততক্ষণ বরং আমিই এখানে অপেক্ষা করি।

লেফ্‌টন্যাণ্ট অবাক হয়ে চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। তারপর বলল, নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ডাক্তার। আমার য়্যুনিটে তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্টাফ ডাক্তার নেই, সুতরাং তোমাকে হারানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাক্তার চুপ করে থাকে।

লেফ্‌টন্যাণ্ট একটু ভেবে বলল, তুমি বরং ওদের মরফিয়া দিয়ে দাও।

ডাক্তারের চোখ দুটি বিস্ময়ে বড় হয়ে ওঠে; বলে, আপনি কী বলছেন, স্যার ?

তারপর সজোরে বারকয়েক মাথা নেড়ে বলে, না, না; এ সম্ভব নয়। আমার সাহস নেই।

লেফ্‌টন্যাণ্ট বলল, যেমন করেই হ'ক ওরা মরবে। আর যুদ্ধে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ নীতি গ্রহণ করারও বিধি রয়েছে। এর সমস্ত দায়িত্ব আমার।

তবুও ঘাড় নাড়ে ডাক্তার; বলে, ডাক্তারের কাজ মানুষ বাঁচানো, স্যার; মানুষকে মারা নয়।

এবার লেফ্‌টন্যাণ্ট চটে ওঠে। বলে, আমি কমাণ্ডার। আমার হুকুম অবহেলা করা তোমার চলবে না। ওদের তুমি এখনই মরফিয়া দিয়ে দাও! আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হবে।

ডাক্তার আবার চেয়ে দেখল লেফ্‌টন্যাণ্টের দিকে। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েই দেখল। কী ভাবল। তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেঞ্চের দিকে।

আধ ঘণ্টা পরে সৈন্যদলকে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে লেফ্‌টন্যাণ্ট সেই ট্রেঞ্চে হাজির হ'ল। দেখল, ডাক্তার ট্রেঞ্চের ধারে একটি কাঠের চৌকির ওপর চুপ করে বসে রয়েছে। চোখ দিয়ে তার টস্‌-টস্‌ করে জল পড়ছে।

আর তারই পায়ের তলায় ট্রেঞ্চের মধ্যে আটজন তরুণ জার্মান সৈন্য মরে পড়ে রয়েছে।

লেফ্‌টন্যাণ্টের চোখেও তখন জল। সে আস্তে-আস্তে ডাক্তারের পিঠে একটা হাত রাখল।

জানি, আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল অগাধ। সূর্যগ্রহণে পৃথিবীর বুকে বিস্ময়ের যে কালো ছায়া নেমে আসে, তোমার মুখে মাঝে-মাঝে আমি সেই ছায়া দেখছি। এমনও হতে পারে, ওটাও তোমার মুখোস। তুমি চেয়েছিলে আমাকে গ্রাস করতে; অথবা ভেবেছিলে, আমি তোমার একেবারে নিজস্ব একটি শিকার। ইচ্ছা করলে, নারীর স্বভাবজাত ছলা-কলা দিয়ে, যে-কোন মুহূর্তেই তুমি আমাকে গ্রাস করতে পার। তোমাদের এই অকারণ দম্ভে আমি মনে-মনে হাসতাম। কারণ, তোমরা আমাকে কোনদিনই নাগালের মধ্যে পাও নি। যদি কিছু পেয়ে থাক, তা আমি নয়, আমার স্থিলোট।

'হ্যাঁ, স্থিলোট-ই। যাকে তোমরা সত্যকার মানুষ বলে ভেবেছিলে, সেটা কিন্তু নকল মানুষ। আসল মানুষটা তখন লজ্জায় এমন একটি জায়গায় মুখ লুকিয়ে বসেছিল, যেখান থেকে তাকে আবিষ্কার করে বাইরে টেনে আনা কেবল যে দুঃসাধ্যই ছিল তা নয়, অসম্ভবও ছিল হয়ত। তোমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমি নিজেই কি ছাই কোনদিন বুঝতে পেরেছি নিজেকে?

তাই যদি পারতাম, তাহলে জীবনের এত বড় ধাপ্পা, আর প্রবঞ্চনাকে ধ্রুব-নক্ষত্রের নির্ভুল নির্দেশ মনে করে সংসার-সমুদ্রে ভেলা ভাসালাম কেন? আর ভাসালাম-ই যদি, তাহলে পেছনের সমস্ত মোহকে মোহমুদ্গরের ভাষ্য মনে করে ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে অবলুপ্ত করার সাহস হল না কেন?

এ-কেনর কোন সদুত্তর নেই। আর নেই বলেই, মনীষীরা জীবনবোধকে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে ধোঁয়াটে করার চেষ্টা করেছেন। তাতে জীবনের গ্রন্থি এতটুকু শিথিল হয় নি; যা হয়েছে, তা একটি বৃত্তকে সরলরেখা বলে প্রচার করার অপচেষ্টা মাত্র।

তুমি বিশ্বাস কর সুচরিতা, জীবনকে আমি কোনদিন কল্পনা-বিলাস বলে ভাবতে শিখিনি। আমার কাছে এ ছিল একেবারে একটি অনার্য সত্য। স্বপ্নাদ্য ওষুধের কর্মক্ষমতায় আমি আজ যেমন অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের অপার মহিমায় আমার অনাস্থা তেমন-ই অটুট। জানি, এর পরে তোমরা আমাকে সিনিক

বলতে দ্বিধা করবে না। না করু আমার ক্ষতি নেই। একদিন সৈনিকের আদর্শ নিয়েই বুক ফুলিয়ে তোমাদের পৃথিবীর পথে-পথে অন্যায়ের প্রতিকার করতে বেরিয়েছিলাম। সেদিন জগৎ-সংসারের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম নিজের মাথায়। ঠিক কখন জানিনে, তবে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, ডন কুইক্‌সোটের মত আমি নিজেই এক সময় সেই আবর্জনায় রূপান্তরিত হয়েছি। ডনের কপাল ছিল ভাল। স্যাংকো পাঞ্জার মত একজন নির্ভরশীল অনুচর জুটেছিল তার। আমার বরাতে যার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হল সে বড় নির্মম, বড় কঠোর। সেই গুপ্তঘাতী দস্যুর দল আঘাতে-আঘাতে আমাকে কেবল ক্ষত-বিক্ষত করেই ক্ষান্ত হল না, আমাকে নিঃশেষে ধ্বংস করতে এগিয়ে এল। কেবল তাই নয়। সেই ধ্বংসের ওপর তারা নিজেদের জন্যে যে মুসৌলিয়ম গড়ে তোলার চেষ্টা করল, তা না হল শব, আর না হল শিব। পিরামিড দেখেই তোমরা মানুষের জয়ধ্বনিতে আকাশ মাতিয়ে দিলে, সুচরিতা; তার অতলান্ত শূন্যতার দিকে চোখ মেলে একবার তাকাবার পর্যন্ত সময় পেলে না।

চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, আর মানুষের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা নিয়েই একদিন তোমাদের এই পৃথিবীতে আর দশজনের মত নেমে এসেছিলাম। এ বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণুকে সহজভাবে ভালবাসার জন্যে কী বিরাট আকুতি না আমার উষ্ণ চেতনার একটি অতি স্পর্শকাতর অংশটিকে বেদনার্ত করে তুলেছিল। সেদিনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধ-চেতনায় নিমজ্জিত থাকার পর যখন প্রথম আত্মবিলুপ্তির অবসান ঘটল, সেই আলো-অন্ধকারের গোধূলিতে বার-বার হয়ত আমি কাকে উদ্দেশ করে যেন বলেছিলাম, হে অপাবৃণু, আমাকে আলো দাও, একাকীত্বের এই নির্জন কারা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রখর সূর্যের আলোতে নিয়ে এস। কিন্তু আমার জন্মলগ্নের সেই প্রথম অশুভ মুহূর্তে অলক্ষ্যে বসে বিধাতাপুরুষ হয়ত বা একটু হেসেছিলেন। না হলে, জীবনপথে অগ্রগতির ধাপে-ধাপে সেই সূর্য কেনই বা আমার মানসপদ্মের সজীব-তাজা পাপড়িগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল! সেই ছাই নিয়ে আমি করব কী? ও দিয়ে রাসায়নিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকের যদি বা কোন কাজ চলে, আমার কাছে ও যে একেবারেই অচল।

আজ ভাবি, আমার তো কোন ত্রুটি ছিল না। জীবনের সঙ্গে মিতালি পাতাতে কোনদিন তো কোন কার্পণ্য করিনি। এমন কি, তারই খেসারৎ

দিতে, পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলিকেও আজ ভুলতে বসেছি। জীবনের জয়গানে মুখরিত কত অজস্র আশা আর উদ্দীপনা, তাদের সকলেই আজ রুক্ষ মরুভূমির বালুস্তরে শুদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের অনেককেই আজ আর চিনতে পারিনে। তবু মাঝে-মাঝে, অসীম ক্লান্তিতে ঢলে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, অজান্তে সাজঘরের মুখোস খসে পড়লে, কখন কখন খোলা জানালার ভেতর দিয়ে পৌষের শিহরণ আমার আকাশে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূরের সেই ঝরা-পাতার দল সজীব হয়ে নব কিশলয়ের মূর্তিতে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমাদের গাঁয়ের বাগানে হাসনাহানা, আর কেয়াফুলের গন্ধ অকস্মাৎ উদ্দাম হয়ে আমার দরজায় লুটোপুটি খায়। একটি অস্ফুট বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ডানলোপিলোর বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে দৌড়ে আসি। দেখি, ওপাশে আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই প্রায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত বাড়িয়েও তাদের নাগাল পাইনে আজ। আর পাইনে বলেই, জানালাটা বন্ধ করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে কতদিন শিশুর মত চীৎকার করে বলেছি, ওগো, তোমরা সব ফিরে যাও। আমাকে এরা বন্দী করেছে, এ-জীবনে আর আমার মুক্তি নেই।

কেমন করে মুক্তি হবে বল? আমি যার কাছে নিজেকে বন্ধক দিয়েছি, যার দাসত্ব করতে আমি আজ প্রতিশ্রুত, যে আমার দিনের কর্ম, আর রাত্রির স্বপ্নের ওপর অবিসংবাদিত প্রভুত্ব বিস্তার করে বসে রয়েছে, সেই বিরাট দৈত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার শক্তি আমার নেই। আমার কোন অসতর্ক মুহূর্তের ছিদ্রপথে ঐ সব শোণপাংশুর দল হঠাৎ প্রবেশ করে পাছে যদি কোন অঘটন ঘটায়, সেই ভয়েই তো হৃদয়দুয়ার আজ নিজের হাতেই রুদ্ধ করে দিয়েছি। সেই লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে চির-প্রবঞ্চিত মানবকের আর্তনাদ তোমাদের কানে ধরা পড়বে কী? কান পেতে শোন, সুচরিতা; ইথারের তরঙ্গে-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত উতরোল কান্নার উচ্ছ্বাস তোমার সজাগ মনের তন্ত্রীতে ধরা দিলেও দিতে পারে হয়ত।

কাল রাত্রে যে মানুষটিকে রোটারি ক্লাবের একটি বিদগ্ধ পরিবেশে সদম্ভ বক্তৃতা দিতে শুনে তোমরা মুগ্ধ হয়ে বার-বার করতালি দিয়েছিলে, নিয়ন লাইটের তুফান আলোতে যাকে মধ্যযুগের নাইটের মত শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্বের ধারক আর বাহক বলে ধারণা হয়েছিল তোমাদের, আর হয়েছিল বলেই, বহু তন্বী সুন্দরী পরিবৃত থাকা সত্ত্বেও, এক যুগ আগে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বিলম্বিত

মর্যাদা দিতে উপযাচিকা হয়ে নিঃসঙ্কোচে আমার একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছিলে, সেই মানুষটা যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি দুর্বল তা জানতে পেরে হয়ত বা স্তম্ভিত হবে তোমরা। হয়ত, এই অভাবিত ঘটনা প্রচারিত হওযার সঙ্গে-সঙ্গে আমার তথাকথিত অগণিত বন্ধু-বান্ধব ভিড় জমাবে এখানে, ফুলের মালা আর 'বুকে'-তে ভরে যাবে আমার ঘরের প্রতিটি আঙিনা। সেই সময়, সুযোগ যদি পাও তো, আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো, সুচরিতা। দেখবে, আমার দেহের কান্তি আর মুখের লাবণ্য সবারব হলাহলে পুড়ে নীল হয়ে গিয়েছে।

জীবন-সমুদ্র মন্থন করে যা পেলাম, তা হলাহল ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ্মী আর অমৃত অপহৃত হল দেববেশী দস্যুদের কাছে। অথচ, আমিও তাদের ভাগ পেতে পারতাম। জীবনের শুরুতে তা পেয়েও ছিলাম। আর পেয়েছিলাম বলেই, ব্যর্থতার হলাহল আজ আমার কাছে এত তিক্ত, এত জ্বালাময়।

আজ সকলের প্রথমেই বাবার কথা মনে পড়ছে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিভূ ছিলেন তিনি। মানুষের ওপর প্রভাব ছিল তাঁর অসামান্য। এই প্রভাব দলিলের জোরে দখল করা নয়। অলো-হাওয়ার মতই তা ছিল স্বাভাবিক। তাই তার আবেদন ছিল অনস্বীকার্য। কোন বিদ্যালয়ে সূক্ষ্ম কলার মত ভদ্রতা শিক্ষা করতে হয় নি তাঁকে। সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত ওটি ছিল তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠব। প্রাচুর্যের মোহকে তিনি অবহেলা করতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় দারিদ্র্যের অগৌরব কোনদিন স্পর্শ করতে সাহস পায়নি তাকে।

এই সংসারে আর পাঁচটি ভাই-বোন, এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই বেড়ে উঠেছিলাম আমি। বাবার বড় ছেলে বলে, প্রিন্স-অফ-ওয়েলস-এর মর্যাদা কোনদিনই আমার কপালে জোটেনি। তাতে বাবারও কোন দুঃখ ছিল না, আমারও না। মাঝে-মাঝে মা-ই যা কিছু দুঃখ করতেন। বাবা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বলতেন: রাজ্য খোয়া গিয়েছে, ইতিহাসে তার প্রচুর নজীর রয়েছে, গিন্নী, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মানুষও খোয়া যায়নি।

কথাটা সত্যি, সৎপথে থাকার জন্যে মোটা প্রিমিয়ম দিতে হয়েছিল বাবাকে। কিন্তু তবু, এতটা তাড়াতাড়ি যে পরপার থেকে তাঁর ডাক আসবে তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। সেদিন আমাদের সহানুভূতি দেখিয়ে অনেকেই সরবে ঘোষণা করেছিলেন, এই পাপের সংসারে চৌধুরীমশায়ের মত পুণ্যাত্মার স্থান নেই। ভগবান তাই তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।

মায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম, বাবার এত বড় সৌভাগ্যেও তাঁর মুখের ওপর আনন্দের কোন দিব্যজ্যোতি ফুটে বেরোয়নি; বরং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একটি আশঙ্কা দুরারোগ্য ক্যানসারের মত তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, ন্যায়, ধর্ম, সততা, আর মানবতার বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে, মৃত পিতার আশীর্বাদকে একমাত্র পাথেয় করে, মধ্যযুগের নাইটদের মত হিংস্র শ্বাপদ-অধ্যুষিত সংসার-অরণ্যে প্রবেশ করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, এ অরণ্যের অন্ধকারে যে সব দৈত্য-দানো ঘাঁটি পেতে বসে রয়েছে, তারা মায়াবী। সাদা চোখে তাদের দেখার কোন উপায় নেই। তাদের আয়ত্তে আনতে গেলে, রাজা দশরথের মত শব্দভেদী বান ছোঁড়ার কৌশল শিখতে হবে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়িটি বছরের শিক্ষা আর সংস্কার মায়ামন্ত্রের অলৌকিক ইন্দ্রজালের কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করতে বাধ্য করেছিল আমাকে। তাই আমি কিছুতেই বিশ্বাস না করে পারিনি যে আমার চারপাশে যেসব অতিকায় দৈত্যগুলি কুহেলিকা সৃষ্টি করে বুক ফুলিয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আসলে তারা নকল রাজা ছাড়া আর কিছু নয়। মোজেজের ন্যায়দণ্ডের আঘাতে বর্বর ফ্যারোয়ার ক্লীবত্বপ্রাপ্তির মত, ভেবেছিলাম, আমার চোখের সামনে যে অন্ধকার কুটিল ভ্রূকুটিতে আকাশ ভারাক্রান্ত করে রেখেছে তা মুহূর্তে কুয়াশার মত দিগন্তে মিলিয়ে যাবে। অথবা, আমার মুঠোর মধ্যে যে পিতৃদত্ত মহামণি রয়েছে তারই স্পর্শে সমুদ্রগর্ভে আমার জন্যে রাজপথের সৃষ্টি হবে, আর সেই রাজপথ বেয়ে পথভ্রষ্ট রাজার কুমারের মত সাতশ রাক্ষসে পরিবেষ্টিত লোহার প্রাসাদে বন্দিনী নিদ্রিতা রাজকুমারীর হৃদয়ের একেবারে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অংশটিতে নিজের জন্যে স্থান করে নিতে পারব।

কিন্তু কোথায় সেই রাজপথ? আর কোথায় বা সেই রাজকুমারী যে উত্তাল তরঙ্গবেষ্টিত প্রবাল দ্বীপের কারাগারে বসে আমার জন্যে দিন গণছে? হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল। বাবার নীতি আর সমাজবোধের লোহার প্রাকারের কোনখানে হয়ত কোন ফুটো ছিল, তারই ভেতর দিয়ে এতদিন ধরে যে অজস্র নোনাজল ঢুকেছে, সেই জল বাবারও শ্বাসরোধ করেছে, আর আমাকেও এমন একটি জায়গায় তলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে যেখানে রাজকুমারীর কোন অস্তিত্ব নেই; রয়েছে কেবল রক্তলোভী লাখ-লাখ রাক্ষসের ক্লেদাক্ত স্বাক্ষর।

একদিন ছিল, যখন সভ্য সমাজ থেকে রাক্ষসেরা সযত্নে নিজেদের সরিয়ে

রাখত। অমিত বলশালী হলেও, দীক্ষার দৈন্যে তারা লজ্জাই পেত। আজ আর সেদিন নেই। আজ মানুষের দিন আর রাত, ধর্ম আর কর্ম, নিদ্রা আর জাগরণ, শিক্ষা আর দীক্ষার ওপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছে এরা। ব্রবডিঙনাগের অতিকায় দৈত্যগুলির মত এরাও সত্যিকার মানুষকে মানুষ বলতে দ্বিধা করছে আজ, নৃতত্ত্ববিদদের থিলাং দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে মনুষ্য নামধারী জীবগুলিই হল সত্যিকারের অপগণ্ড।

কিন্তু সংস্কার যার মজ্জায়-মজ্জায় রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, তাকে তুমি কেমন করে বোঝাবে যে মানুষ মানুষ নয়, আসলে মনুষ্যেতর একটি জন্তু? দীর্ঘ বিশ বছরের সেই সংস্কার, প্লাস্টার অব প্যারীসের মত আমার সমস্ত বহির্গামী চেতনার মুখ রুদ্ধ করে দিলে। আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো গেল না যে, সংস্কৃতির যে ভয়াল দানবটি আজ কাচের ঘরে জলবাসী জন্তুর মত উন্মত্ত আবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকেই পূজা করা মানুষ হিসাবে আমার প্রথম কর্তব্য।

না, মানুষের ওপর আস্থা হারাতে পারিনি, আর পারিনি বলেই তো হয়, এক সময় নিজের অজান্তেই কখন নিজের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে বসেছি।

জগৎ-সংসারের প্রাণহীন অনপায় ঘটনাপ্রবাহের আঘাতে-আঘাতে যখন আমি ক্ষত-বিক্ষত, সেই সময় মায়ের একখানি চিঠি পেয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমাদের সংসার তখন অনাহারে অর্ধাহারে চলেছে। তারই ছাপ পড়েছে চিঠির মধ্যে। সংসারে আমি জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম হলেও, দুটি বছর মা অপেক্ষা করেই বসে ছিলেন। দোষ ছিল না তাঁর। হয়ত তিনি আমার অকর্মণ্যতার কথা জানতেন।

তিনি অনেক দুঃখ করে লিখেছেন। নগেনকে সব জানিয়েছিলাম। সে একশটা টাকা পাঠিয়েছে। তাই এ-যাত্রার কোন রকমে রক্ষা পেলাম। তার সঙ্গে তোমার এতদিন দেখা করা উচিত ছিল। হাজার হক, সে তোমার মামা। তোমার জন্যে সে কিছু একটা করবেই।

হ্যাঁ, মামাই বটে, এবং বড়লোক মামা। যে মামা তার বাপ-মা, ভাই-বোন সকলকে ফাঁকি দিয়েছে, চোরাই মদের ব্যবসা করেছে, তিন তিনবার জেলের দরজা থেকে ফিরে এসেছে কেবল টাকার জোরে, সেই মামা আজ লাখপতি। এবং যে ভাই-এর নাম পর্যন্ত এতদিন মা উচ্চারণ করতে লজ্জা

পেতেন, সেই মা ভাইয়ের কাছে বিপদে হাত পেতেছেন। একটু হাসলাম। বাবার নীতিশিক্ষা কি ব্যর্থ হ'ল তাহলে? বাবা বলতেন, অভাবটা মনের, ওকে এতটুকু প্রশ্রয় দিলে ও শেষ পর্যন্ত সিন্ধাবাদের দৈত্যের মত মাথায় চড়ে বসবে।

কিন্তু সত্যি কি তাই? যে-মাকে নিজের চোখের সামনে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়েদের অভুক্ত অথবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় দেখতে হয়, অর্থের অভাবে যাদের মানুষ করার চিন্তা আকাশ-কুসুমেরই মত, তাঁর পক্ষে কি অনটনের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব? বাস্তব ক্ষেত্রে বাবার এথিক্স-বজায় রাখা আর দাঁত দিয়ে পাথর গুঁড়ো করা কি একই কথা নয়!

শেষ পর্যন্ত মামার কাছেই হাজির হলাম; এবং তাঁরই প্রশংসাপত্র নিয়ে একদিন প্রভাতকালে ক্যাপটেন ব্যানার্জির দরজায় কলিং বেল টিপলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকরি হ'ল আমার।

নতুন উদ্যমে জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু করলাম। এককালে ব্যানার্জি সাহেব মিলিটারী ডাক্তার ছিলেন। লম্বা-চওড়া চেহারার ওপর মেদবৃদ্ধির অনুপাতটি লক্ষ্যণীয়। কেবল মাথাটিই শরীরের অনুপাতে কিছুটা ছোট। সেই মাথা আর চেহারার আয়তন দেখে ক্যাপটেন সাহেবের ওপর আমার যে ধারণা জন্মাল, চাকরি হওয়ার কয়েকটা দিনের মধ্যেই সে ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম আমি। শনৈ শনৈ বুঝতে পারলাম, বয়স আর শরীরের মত তাঁর প্রতিভাও বিরাট এবং বহুমুখী। বড়বাজারে কাপড়ের দোকান, হগ মার্কেটে ওষুধের দোকান। তার ওপর একজন সত্যিকারের প্রতিভাধর রেশ খেলোয়াড়; বিগত ত্রিশটি বছরে কলকাতার মাঠে যে সমস্ত অশ্বপুঙ্গব বাজিমাৎ করেছে তাদের ঠিকুজী-কুষ্ঠি, আর জন্ম-ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ। বর্তমানে শরীরটি বেকায়দায় পড়ায় এক নামকরা ইভেণ্ট ছাড়া আজকাল বড় একটা মাঠে যান না, পাঠান তাঁর এজেণ্টকে। কেবল তাই নয়; সম্প্রতি সাহিত্য-সৃষ্টির সখ চেপেছে তাঁর। এবং এ-বিষয়েও তাঁর একটি সুস্পষ্ট মতবাদ রয়েছে। গল্প, কবিতা, আর উপন্যাসকে কাঁচের চুড়ির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলতেন, একটা জাতির সংস্কৃতির মেরুদণ্ড হচ্ছে তার প্রবন্ধ।

বাঙলাদেশের সেই ক্ষীয়মান মেরুদণ্ডটিকে সঞ্জীবিত করতে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীটিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। পালিশকরা চকচকে কাঁচের আলমারির মধ্যে প্রায় শ'তিনেক গ্রন্থ; ভাল

রেক্সিন দিয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে বাঁধানো। প্রতিটি গ্রন্থের পুটের ওপর সোনালি জলে ক্যাপটেন সাহেবের নাম-ধাম লেখা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এতগুলি গ্রন্থের লেখক ক্যাপটেন সাহেব নিজেই।

কয়েকটি দিনের মধ্যেই ক্যাপটেন সাহেবের নিয়মতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সকাল নটায় তিনি লাইব্রেরীতে হাজির হতেন। একে বৃদ্ধ, তাতে সম্মানিত। তার ওপর অনেকদিন থেকে ডায়াবেটিস আর রক্তের আধিক্যে ভুগছেন। লক্ষ্মী তাঁর পেছনে-পেছনে পোষা বুলডগের মত ঘুর-ঘুর করছেন। নটায় কাজ শুরু করার অধিকার ছিল তাঁর; কিন্তু ঐ একবার উঠেই যে স্টাডিতে এসে গা এলিয়ে দিতেন, এখন বারটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। ঐ সময়টিতে বিশেষ নিয়মমাফিক চলতে হোত আমাকে। প্রথমেই তিনি নোট বইটির দিকে ইঙ্গিত করতেন। সেই নোট থেকে রেফারেন্সগুলি টুকে নিতাম। বইগুলি লাইব্রেরীতে থাকলে তো বাঁচোয়া; না থাকলে, বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ঘুরে বেড়াতে হোত। সেই সব বই থেকে নানা রকম উদ্ধৃতি আমার খাতার মধ্যে আত্মগোপন করত। ইংরাজী হলে, তাদের বাঙলা তর্জমা করারও দায়িত্ব থাকত আমার ওপর। সেই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি মাঝে-মাঝে এলোমেলোভাবে পড়ে যেতেন তিনি। আমি টুকে নিতাম। এই হল তাঁর ওরিজিন্যাল প্রবন্ধ!

প্রতি রবিবারই বিকেলে তাঁর বাড়ীতে সাহিত্যচক্রের মজলিস্ বসত। তিনি ছিলেন এই চক্রের চিরস্থায়ী সভাপতি। দশ-বারজন সভ্য নিয়মিত আসতেন এখানে। তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়ের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের কাছে ক্যাপটেন সাহেব স্বলিখিত (?) ওরিজিন্যাল প্রবন্ধ পাঠ করতেন। সভ্যরা একবাক্যে প্রশংসায় সহস্রমুখ হয়ে উঠতেন। তারপর, প্রচণ্ড জলযোগ সমাপ্ত করে, ক্যাপটেন সাহেবের অবিলম্বে সাহিত্যপ্রতিভা-স্বীকৃতির সম্ভাবনায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার পর স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করতেন তাঁরা।

প্রথম কয়েকটি দিনের আলাপ-আলোচনা আর ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে বেশ বোঝা গেল, ক্যাপটেন সাহেব একজন উগ্র সমাজসেবী। তাতেও আমার বিপদ ছিল না। বিপদ তখনই দেখা দিল, যখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সমাজ-জীবনের বহুবিধ জটিল সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। আলোচনার নাম করে নিজেকে যে সম্মানিত করলাম, ব্যাপারটি কিন্তু আসলে তা নয়! বলার কাজটি একমুখী, অনেকটা গোমুখী থেকে অশ্রান্ত কল্লোলে বহির্গামিনী গঙ্গার স্রোতধারার মত। আমাকে

কেবল ঘাড় নেড়ে-নেড়ে অথবা সময় বিশেষে, উচ্ছ্বাস দেখিয়ে, তাঁর মতবাদ সমর্থন করতে এবং অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হোত। করকরে দু'শ টাকার খেসারৎ দিতে-দিতে দেউলিয়া হয়ে গেলাম, সুচরিতা ; সুদের রাবিশে শেষ পর্যন্ত আসলটাই পড়ে গেল চাপা।

সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দিনের পর দিন কী করে যে চিন্তার ব্যাভিচারে নিজেকে কলুষিত করে চলেছিলাম, তা ভাবতে গেলেও সেদিন শিউরে উঠতে তুমি। যে মানুষটির ব্ল্যাক-মার্কেটের গোপন পথ আবিষ্কারের সহজাত প্রতিভা, আর আয়কর ফাঁকি দেওয়ার কারসাজি আমাকে টলাতে পারেনি, সেই লোক যখন ভারতবাসীর চারিত্রিক দুর্বলতাকে কটাক্ষ করে, প্রাচীন ভারতেব লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য—ন্যায়, ধর্ম, আর সততার পুনরুদ্ধারের ওপর সবিশেষ জোর দিয়ে, মনস্তত্ত্বমূলক (!) আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ (!) প্রবন্ধ লিখে আমারই সমর্থনের জন্যে অহেতুক অপেক্ষা করে বসে থাকতেন, তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, আর নিজের অপদার্থতায় দেওয়ালের বুকে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হোত আমাব। সেই দুশ টাকার একখানি চেকেব উদ্ধত যষ্টি আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেল, আমাকে অকর্মণ্য কবে তুলল। মনুষ্যত্বেব লাঞ্ছনায় মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখলে পুরা-কালের রাজাবা যেমন তাজাপ্রাণ তাতাব নর্তকীদের অস্তিত্ব দেওয়ালের মধ্যে নিঃশেষে মুছে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করত না, তেমনি আমি জানতাম, ঐ দুশ টাকাব রক্তচক্ষুব সামনে নিজেকে আহুতি দিতে না পারলে, আমার এবং আমার ওপব নির্ভব কবে বয়েছে যারা, তাদের অস্তিত্বও পৃথিবী থেকে মুছে যেতে এতটুকু বিলম্ব হবে না।

কিন্তু শুধু কি তাই? প্রতি দিন যাপনেব সহস্র লাঞ্ছনা আর হাহাকাব যে আমি নীরবে সহ্য করে এসেছি, সে কি মাত্র ঐ দুশ টাকা হারাবাব ভয়ে? না, অন্য কিছু হারানোব ভয আমাব অবচেতন মনের গোপনে আত্মপ্রকাশ করেছিল?

তুমি কি জান, সুচরিতা? সেই মেঘমেদুর বর্ষামুখর রাত্রির কথা কি তুমিও ভুলে গিয়েছ একেবারে? যদি ভুলে গিয়ে থাক, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আমি কিন্তু ভুলতে পারি নি। সেই একটি রাত্রিই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা নিয়ে আমার সমস্ত জীবনের মূলশুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। সেই কথাটিই আজ বলি তোমকে।

শান্ত, গম্ভীর, সুশৃঙ্খল আর নিয়মতান্ত্রিক ক্যাপটেন সাহেবের সংসারে

তুমিই ছিলে একমাত্র ব্যতিক্রম। সাত খুন নয়, দাদুর কাছে তোমার সহস্র খুন মাপ ছিল। দাদুর বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে তুমি। আর আমি? ঝড়ো হাওয়ার মত চঞ্চল উদ্দাম গতিতে তোমার গাড়ী পোর্টিকোর সামনে ব্রেক কষা মাত্র, কি জানি কেন, আমার বুকের মধ্যে রক্তের সমুদ্র তোলপাড় করে উঠত। কোনদিনই তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিনি আমি। মাঝে-মাঝে তোমাকে চুরি করে দেখেছি। তুমি দাদুর ঘরে এসেছ, পাষাণ-গম্ভীর দাদুকে ঝর্ণাধারার মত প্রবাহিত করেছ, যমদূতের মত বুলডগ দুটোর কান ধরে উঠবোস করিয়েছ। আমি তখন সারাক্ষণই নিতান্ত অপরিচিতের মত ভারত-বাসীর অধঃপতনের দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত ক্যাপটেন সাহেবের যুগান্তকারী ওরিজিন্যাল প্রবন্ধসমুদ্রের নোনা জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় তটস্থ। তবু, তোমার গতি আর ভঙ্গিমার প্রতিটি ধ্বনির সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। হয়ত, মাঝে-মাঝে অকস্মাৎ তোমার কলগুঞ্জন থেমে গিয়েছে; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার মুখের দিকে নেহাৎ যান্ত্রিকভাবেই মুখ তুলে চেয়েছি। চোখাচোখি যে হয়নি তা নয়। তখন দেখেছি তোমার চোখের তারায় অকারণ কৌতুকের নাচন। আর আমার? আমার চোখে কী দেখেছিলে তুমি? ভীরু কপোতের রক্তহীন চাহনি! হবেও বা।

তারপর, একদিন আবার তোমার গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠল। সেদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল। আমার মনের আকাশেও তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল। অবিরাম রিম-ঝিম ধ্বনিতে ভারাক্রান্ত উত্তরসন্ধ্যার পৃথিবী যেন আমারই মনের প্রতিচ্ছবি। ক্যাপটেন সাহেব ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। শরীরটা তাঁর সেদিন ভাল ছিল না। আমি একাই লাইব্রেরীতে বসে কাজ করার ব্যর্থ ভণ্ডামিতে ক্লান্ত।

লঘু চরণের অবারণ চঞ্চলতায় লাইব্রেরীতে সোজা হাজির হলে তুমি। হয়ত দাদুর খোঁজেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কি জানি কিসের একটি অধীর প্রতীক্ষায় চুপ করে বসেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, ফিরে যাবে তুমি। কিন্তু ফিরে তুমি গেলে না।

মাঝখানের কয়েকটি মুহূর্ত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সময়। কৌতূহলে ঘাড় ফিরোলাম। কিন্তু তার আগেই অনাবশ্যক কৌতুকে তোমার মুখটি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আমার পিঠের ওপর। তোমার গালের স্পর্শ লেগেছিল আমার মাথায়। তোমার চুলের সুরভি ছড়িয়ে পড়েছিল আমার চোখে, মুখে, দেহে, মনের সর্বাঙ্গে।

খিল-খিল করে হেসে উঠলে তুমি : বাবা, লজ্জায় মেয়েদেরও হার মানালে দেখছি।

চকিতে ঘুরে বসেছিলাম সেদিন। তোমার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে এসে পড়েছিল। হয়ত সতর্ক ছিলে না বলেই। তোমার চোখে সেদিন কী দেখেছিলাম জানি নে। কিন্তু একথা জানি যে সেদিন তোমাকে আমার দুটি বাহুর মধ্যে ধরে আমার পৌরুষের প্রথম স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছিলাম তোমার মুখে, গালে, আর মাথায়। তুমি কোন কথা বলনি, করনি কোন প্রতিবাদ। তোমার ভীরু বুকের দ্রুত উত্থান-পতন আমার বুকে আঘাত করেছিল কেবল। তুমিও কি আমারই মত ভীরু ছিলে সেদিন ?

না, ভীরু নয়। বিস্ময়বিহ্বল কয়েকটি চকিত মুহূর্তের পর উঠে পড়লে তুমি। উত্তেজনায় তখন তুমি থরথর করে কাঁপছ। তোমার চোখে ক্রুদ্ধ ধূর্জটির তৃতীয় নয়নের জ্বালা ধকধক করছিল। তোমার বঙ্কিম নয়নের সেই তির্যক চাহনি সহ্য করতে পারলাম না। তবে কি তোমাকে বুঝতে ভুল করেছিলাম আমি ?

অসভ্য, ছোটলোক, ইতর, কোথাকার। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার লোভ।

ঘৃণির আবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তুমি। সীমাহীন দৈন্য আর ধিক্কারে একেবারে মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বললাম, হে ধরিত্রি, দ্বিধা হও।

বর্ষামুখর রাত্রির একটি নর্জন মুহূর্তে আমার চেতনায় অকস্মাৎ যে ক্ষণবসন্ত নেমে এসেছিল, তার সঙ্গে সেদিন আমি বিদ্যুতের তুলনা না করে পারিনি। আর তুলনা করেছিলাম বলেই বোধ হয় বিদ্যুতের ঝিলিক মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার চারপাশে ব্যর্থতার কালো মেঘ বিপুল আবেগে ঘনীভূত হয়ে আমাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

তুমি বিশ্বাস কর সুচরিতা, তিনটি বছর আমি এই কলকাতার পথে-পথে কাঙালের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। মানুষের একটু সহানুভূতি, এতটুকু করুণা পেলেই হয়ত নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু তা পাইনি। এ জগতে সংস্কৃতির ঘাঁটি কম নেই। সকলেই পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করার মহতী প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। সাহিত্য বল, শিল্প বল, ধর্ম বল, মনুষ্যত্ব বল, সকলেই নিজেদের ঘাঁটির মধ্যে আত্মগোপন করে বসে রয়েছে। ভয়ে আর বিস্ময়ে দেখেছি, তাদের সেই অচলায়তনের সিংহদ্বার রুদ্ধ। তার সামনে সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহারা বসেছে। সে-পাহারা বড় কড়া। টাকার ঝুলিকে

তারা যতটা সম্মান দেখায়, মনুষ্যত্বের আবেদনকে ঠিক ততটা অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দেয়।

জীবনের সেই দুর্দিনের একটি পরম লগ্নে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। আর একটি অসতর্ক মুহূর্তের চটুল বঞ্চনায় আমার বিশ্বাসের শেষ ঘাঁটিটুকুও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার সত্তার প্রতিটি অণুর মধ্যে একটানা অবিশ্রাম ছি ছি ধ্বনি ধিক্কারে ধিক্কারে আমাকে জর্জরিত করে তুলল। সেই বর্ষামুখর থমথমে ভৌতিক রাত্রির সমস্ত কিছু অনিশ্চয়তাকে অগ্রাহ্য করে যখন দিগবিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ব্রেকভাঙা ইঞ্জিনের মত দৌড়ে চলেছিলাম, তখন কে যেন বারবার আমার কানের কাছে বলেছিল, আর কেন, আর কেন?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটি পাথরের ওপর বসে রয়েছি আমি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে এসেছে। তারই কোন এক ফাঁকে আধফালি চাঁদ বিপুল বিতৃষ্ণায় নিজের অস্তিত্বটুকু কোন রকমে বজায় রাখার চেষ্টায় ক্লান্ত। দূরে কয়েক হাজার তারা চিক-চিক করছে। আর আমার পায়ের নিচে, শ্রাবণের ভরা গঙ্গায় সাপের ফনার মত ছোট-বড় ঢেউগুলি ছোবল দিয়ে-দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম নদীটিকে। হঠাৎ মনে হল, অনর্থক বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। একদিন আশা ছিল, আনন্দ ছিল, মানুষ বলে গর্ব ছিল, একদিন ভেবেছিলাম, মানুষের পৃথিবীতে মানুষ বলে স্বীকৃতি পাওয়ার মত সোজা জিনিস আর নেই। কিন্তু ঐ ক-টি বছরের জীবনসংগ্রাম আমার আশাকে কুরে-কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। প্রতিদিন যাপনের উঞ্ছবৃত্তি আর হাহাকার আমার চেতনাকে স্তিমিত করে দিয়েছে। এখনও মানুষের মন নিয়ে এই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। কেবল শেষের দিনে তোমাকে এই কথাটি বলে যাব, হে ভগবান, তোমার কৃপণ করুণার দ্বারে আত্মবিক্রয় করতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

কিন্তু এ কি? নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম কেন? উৎস কোথায় জানিনে; মনে হল, দিগন্তের ওপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলে বিরাট একটি অট্টহাসি জেগে উঠেছে, একটানা হা হা হা। যেন কেউ ব্যঙ্গ করছে আমাকে।

ভীরু চোখে চারপাশে চেয়ে দেখলাম। মধ্যনিশীথের সেই নির্জন পরিবেশে কেউ কোথাও নেই; আকাশের বুকে আধফালি চাঁদটাও কখন ডুবে গিয়েছে। দক্ষিণের দূর প্রান্তে, দিকচক্রবালের ওপরে মাত্র কয়েকটি নক্ষত্র বিপুল আয়াসে

অন্তর্নক্ষত্রলোকের অতলান্ত শূন্যতায় পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে রাশি-রাশি বোবা কান্নার মত অর্থহীন শব্দের পুঞ্জীভূত হাহাকার তালগোল পাকিয়ে বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছে। হঠাৎ মনে হল, একটি পললাসী উন্মত্ত বীভৎসতা এ-বিশ্বের সমস্ত শুভ্র আর জ্যোতির্ময়কে হত্যা করার দানবীয় শক্তি নিয়ে পুচ্ছনাদ করছে; আর সেই সুদূরপ্রসারী অন্ধকারের অরণ্য-গুহায় হাজার-হাজার ক্ষুধার্ত হায়নার দল বিকট লাস্যে আপনাদের সদন্ত অস্তিত্ব প্রচার করে চলেছে।

একটানা হা, হা, হা, হা। এই বিরাট ব্যঙ্গের প্রতিধ্বনি আমাব সমস্ত সত্তার মধ্যে একটি ঘৃণ্য সরীসৃপের মত কিলবিল করে উঠল। মনে হল, দিগন্ত-প্রসারিত সেই প্রাক্‌সৃষ্টির অন্ধকারের উজান বেয়ে একটি অতিকায় কবন্ধ যেন তার শালপ্রাংশু বাহু মেলে আমার দিকে থপ-থপ করে এগিয়ে আসছে। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলেই হয়ত সে আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলবে।

এতক্ষণ মৃত্যুর যে সদিচ্ছা জেগেছিল, তা হঠাৎ কখন কর্পূরের মত উবে গেল। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গঙ্গার পাড় ছেড়ে দৌড় দিলাম।

সেই রাত্রিটাই আমার কল্পনার রাজ্যে সত্যিকারের দানবীয়। ডক্টর জেকিলের মিস্টার হাইডে রূপান্তর। একটি মৃত্যুর অন্তরাল দিয়ে আর একটি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেই রাত্রিতে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে বারবার অনুভব করেছি, আমার মাথার কাছে বসে একটি কালো জানোয়ার তার লোমশ বপু দিয়ে পরম স্নেহে আমাকে আচ্ছন্ন করে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করছে। যতবারই বিস্ময়, অস্বস্তি, আব ভয়ে আঁৎকে উঠে চীৎকার করতে গিয়েছি, ততবারই সে তার থাবা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে; কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে সান্ত্বনা দিয়েছে। তাকে চিনি নে, জানি নে; তবু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারিনি; তবু তার আবেদন তীব্র, তার স্বীকৃতি মর্মান্তিক।

তারপরের দশটি বছর। সে অন্য এক জগৎ, অন্য এক মানুষের কাহিনী।

শয়তান মহানুভব। যতটুকু প্রয়োজন, তার অনেক বেশী সে আমাকে দিয়েছে। অর্থ, যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তি। তাই দিয়ে আজ আমি মনুষ্যত্বকে ঝুঁটি ধরে উঠবোস করাচ্ছি। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে সুচরিতা, এ জগতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, আর মনুষ্যত্ব কত সস্তা! খোলা হাটে লোহা-তামার মত এদের কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে, আর সামর্থ্য থাকলে, এ-জগতের

সমস্ত সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি, আর মনুষ্যত্বকে বাজার থেকে তুলে এনে গুদোম-জাত করে রাখাটাও কষ্টসাধ্য নয়।

সেদিক থেকে বিচার করলে আমিও আজ সফল। আর সফল বলেই একদিন যারা আমাকে অপার বিতৃষ্ণায় মানুষের সমাজ থেকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল, আজ তারাই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে আমার কৃপাভিক্ষা করার আশায় আমারই বাড়ীর দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে থাকে। আর যে-তুমি একদিন আমার নিষ্পাপ প্রথম ভীরু প্রেমকে অপমানের জ্বালায় জর্জরিত করেছিল, সেই-তুমি পর্যন্ত আজ আমাকে প্রেমের দেবতায় রূপান্তরিত করতে এতটুকু দ্বিধা করনি। জগতে এইটাই বোধ হয় আমার কাছে একটি পরমাশ্চর্য দুর্ঘটনা।

যা বলছিলাম। শয়তান তাব সমস্ত ভাঁড়ার অকৃপণ হাতে আমার সামনে উজাড় করে দিয়ে প্রমাণ করেছে সে ভগবানের চেয়েও বড়। তার কাছে আমি অনেক পেয়েছি। কোন প্রতিদান দিতে হয় নি আমাকে। সে কেবল চেযেছিল আমাব আনুগত্য। চাঁদ সওদাগরেব মত চোখ বন্ধ করে পরম বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে করেও যদি একটিমাত্র পূজার ফুল তার পায়ে ছুঁড়ে দিতাম, তাতেও তাব কোন আপত্তি ছিল না। শয়তান মহানুভব, নয়ত মহানুভব কে ?

কাল রাত্রিতে হঠাৎ কার আর্তনাদে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল, কে যেন অশ্রান্ত আবেগে অসহায়ের মত গুমরে-গুমরে কাঁদছে। যেন কত পরিচিত সেই স্বর। একদিন তার সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল আমার; আজ ঠিক ধরতে পারছি নে তাব রেশটিকে। মুখ তুলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম চারপাশে। ঘবের মধ্যে জটিল ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার; আব তারই অন্তরালে কোন্ অন্ধনির্জন কাবার গোপন কক্ষে বসে একাকীত্বের যন্ত্রণায় সেই আর্তনাদ গোঙিয়ে-গোঙিয়ে চলেছে। যেন কত যুগ ধরে, সে কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে সেই কান্নার উৎসটি খুঁজে পেলাম। স্তিমিত চেতনার ক্ষণিক অবসর যাপনের সুযোগে আমার অবচেতনার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে নির্যাতিত মনুষ্যত্বের বোবা-কান্না অস্ফুট আবেগে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কেন, কেন ? আজ তো তোমার কোন অভাব রাখিনি আমি, আজ তো কোন অভিযোগের সুযোগ নেই তোমার। সফলতার উচ্চ শিখরে আমি যার জয়োধ্বজা নিয়ে

কলোসাসের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেই মহাশক্তিধরের বদান্যতায় তোমাকে আমি স্বর্ণের মত ভাস্বর করে প্রকাশ করব। অভিধানে মনুষ্যত্বের নূতন ব্যাখ্যা করব। হে আমার মনুষ্যত্ব, শান্ত হও, শান্ত হও।

হঠাৎ একটি অপরিসীম ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়লাম। মনে হল, পর্বতের সেই শিখরচূড়া থেকে বিরাট একটি তুষার ঝড় তার সুবিপুল দুটি ডানা মেলে তীব্র ভাবে উড়ে আসছে আমার দিকে। তার সেই পক্ষবিধূননের বজ্রনির্ঘোষে সৃষ্টির প্রথম অন্ধকারের বুকে সমুদ্র-আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। একটি দেহহীন, মূর্তিহীন, রূপ-রস-গন্ধহীন কদর্য শব্দপুঞ্জের রথচক্র আমাকে পিষে ফেলার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে। আমি শিউরে উঠলাম। বুঝলাম, আমার আত্মবলিদানের মুহূর্ত আসন্নপ্রায়।

আজ থেকে সেই দশটি বছর আগেকার একটি বর্ষামুখর রাত্রির কথা বিদ্যুতের ঝলকের মত মনে পড়ল। হে ভয়াল, সেই দিনই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শুনে তুমিই সেদিন তোমার বরাভয় হস্ত প্রসারিত করেছিলে। অভয় দিয়েছিলে আমাকে। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আগামী দশটি বছর প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দাও, রাজা।

কথার খেলাপ করনি তুমি। আমিও আজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। তোমার চরণে নিজেকে আহুতি দিয়ে দশ বছর আগেকার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করব আজ। আমি তোমার সেই অনস্বীকার্য পদধ্বনি শুনেছি। একটু অপেক্ষা কর তুমি।

সুচরিতা, তোমাদের এই জগতে দশটা বছর যা দেখেছি তার বুঝি সত্যিই আর কোন তুলনা নেই। মানুষ কখনও মুখোসের সঙ্গে আপোষ করে বাঁচতে পারে? মাঝে-মাঝে আমার ধমনীতে যখন মানুষের তাজা রক্ত চনচন করে উঠত, তখনই দেখতাম কোটি-কোটি মুখোসের বিকৃত অট্টহাসির ছটা। যদি ঐ মুখোসগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতাম? কিন্তু সে সাধ্য আমার কোথায়? সে সামর্থ্যও আমার নেই।

আমার এই দেহটাকে নিয়ে তোমরা উৎসব করো না, সুচরিতা; ভূষিত করো না কোন মালাচন্দন আর নিষ্পাপ গোলাপের পাপড়ি দিয়ে। অগ্নিশুদ্ধির অজুহাতে এমন একটি মূল্যবান দলিলকে ভস্মীভূতও করো না। লোকালয়ের বাইরে কোন একটি নির্জন জায়গায় অযত্নের বেড়া দিয়ে কবরস্থ করো। যদি

কোনদিন, কোন হাজার বছর পরে, কোন এক খামখেয়ালী প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে আমার হাড় ক'খানা ভেসে ওঠে, সে দেখবে কী? শুধু কি দেখবে আমার অস্থি-র গাঁথুনি আর মজ্জার ক্রমবিন্যাস? আমার মধ্যে যে একটি বিকৃত যুগের ইতিহাস বোবা ইঙ্গিতে তার বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকবে, তার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকের লক্ষ্য পড়বে কি?